

ভাষাসমূহে বহুবিধ প্রবন্ধ, সঙ্গীত * ও নাটক প্রভৃতি রচনা করিয়া তখনকার গণ্যমান্য সম্প্রদায়ের শুভামুখ্যায়ী বন্ধু, লুকাবি ও নাট্যকলা-বিশারদ ও নাট্য-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে মহা বক্তৃতা বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। নাট্যাম্বুরাগী হইয়া বাবু কালীপ্রসন্ন নিংহের ছায় ইনিও নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 'বিজ্ঞানসুন্দর', 'যেমন কথ্য তেমনি ফল', 'উভয় সফট' ও 'চক্ষুদান' প্রভৃতি নাটক প্রভৃতি সেই চেষ্টার তেমন ফল। এক কথায় এ প্রদেশে ইঁহারই যত্নে ও আগ্রহে নাট্যাভিনয়ের ও নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার প্রথম সূত্রপাত হয় বলিলেও চলে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি এই মহাত্মা তখনকার কালের প্রায় সকল সম্ভ্রান্ত নাট্যসম্প্রদায়ের উৎসাহদাতা পরামর্শদাতা ও সহযোগী কদম্বী বন্ধু ছিলেন। আর এক কথা ইনিই সহোদর রাজা ক্রীষ্ণকুমার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নাট্যাভিনয়ের সহিত ঐক্যতান বাদনের প্রথা প্রবর্তিত করেন (এই ঐক্যতান বাদন প্রথা নাট্যশালার অন্তর্বিষেব হিসাবে ইহার সহিত জড়িত বলিয়া প্রকারান্তরে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে এরূপ সংকল্প রহিল) বাবু গৌরদাস বসাক মহাশয় এই সকল বিষয়েও সাফল্য দিয়াছেন। তাঁহার লিখিত Oriental Theatre এর উল্লেখ কথায় তিনি বলিতেছেন,—It was Babu (since Maharaja Sir) Jotindra mohan Tagore, who first of all suggested to them that they should introduce native Dramatic representation, and organise a native orchestra on the basis of our native instruments”

* বেঙ্গলেগিয়া নাট্যশালায় মধুসূদনের প্রথম নাটক ‘শর্গিষ্ঠা’ যখন অভিনীত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত ও নির্দ্ধারিত হইল, তখন মহারাজ বতীন্দ্রমোহন বর্মা ই ‘শর্গিষ্ঠা’র অন্তর্করেকটি সঙ্গীত রচনা করিলেন। এই নাটকের শেষাঙ্কের শিব যোজ্য বিবরক হৃদয় গীতটি তাঁহারই রচিত। (মাইকেল জীবনী) বোধ হয় এই সকল গীতই তাঁহার সঙ্গীতাদি রচনার প্রথম অন্তর্ভুক্ত।

পাথুরিয়াঘাটার এই সুবিখ্যাত নাট্যসম্প্রদায়ের বহু বর্ষব্যাপী জীবনকাল মধ্যে কলিকাতায় ও অজ্ঞাত স্থানে অনেকগুলি নাট্যাভিনয় হইয়া গিয়াছিল। এখানে সেই সকল নাট্যাভিনয়ের কথা সংক্ষেপে কিছু কিছু প্রদত্ত হইল।

১২৭২ সালের চৈত্র মাসে (ইং ১৮৬৬ মার্চ) ভবানীপুরে 'অষ্টবর্তনিক নাট্য-মন্দির' নামে প্রতিষ্ঠিত এক নাট্য-সম্প্রদায় ৬ নীলমণি মিত্রের বাটীতে (হাইকোর্টের সেই স্বনামখ্যাত জঙ্গ স্থার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়দিগের পুরাতন বাটী) বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত 'সীতাব বনবাস' নামক এক নাটকের অভিনয় করেন। জঙ্গ মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ সুবিখ্যাত পাথোয়ারী শিক্ষক বাবু কেশবচন্দ্র মিত্র মহাশয় শিক্ষিত এক একতান বাদন সম্প্রদায় এই অভিনয়ে নাট্যকাণ্ডের বিরাম স্থানে বাস্তব করিয়াছিলেন।

১২৭৩ বৈশাখে (১৮৬৬ এপ্রেল) পটলডাঙ্গার 'আড়পুলি' পল্লীস্থ 'আড়পুলি নাট্যসমাজ' নামধের এক নাট্যসম্প্রদায় 'মহাশ্বেতা' নামক নাটক অভিনয় করেন। ইঁহারা ক্রমান্বয়ে 'শকুন্তলা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'চন্দ্রাবলী' ও 'এঁরাই আবার বড় লোক' নামক নাটক প্রহসনাদি অভিনয় করেন। 'প্রাণীরজাত' প্রণেতা বাবু সাতকড়ি দত্ত এই সম্প্রদায়ের সম্পাদক ছিলেন। সিমুলিয়ার আন্ততোধ বাবুর বাড়ীর 'শকুন্তলা' ও 'মহাশ্বেতা' নাটক দুইখানির সহিত এই আড়পুলির সম্প্রদায়ের নাটক দুইখানি নাকি পৃথক এবং এই সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তির ইহাদের রচয়িতা। 'চন্দ্রাবলী' নাটকের রচয়িতা বাবু নিমাই চরণ শীল।

ঐ ১২৭৩ সালের মাঝামাঝি সিমুলিয়া ওড়ীপাড়া পল্লীর ওড়ী-দিগের বাটীতেই এক নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হইয়াছিল। 'পদ্মাবতী' নামক নাটকখানি এইখানে অভিনীত হয়। বাগবাজার রায়কান্ত

বঙ্গের দ্বীপ নিবাসী বাবু গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বঙ্গে সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার একজন প্রধান অগ্রণী ও উদ্যোক্তা, এই সম্প্রদায়ের নাট্য শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ‘কল্কী’র ভূমিকা গ্রহণ করিয়া প্রথম অভিনেতা রূপে সাধারণ সমক্ষে বাহির হইলেন। ‘নাট্যমন্দিরে’ এই নাট্যকলা কুশল অভিনেতা ও স্বামী নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার অন্ত্যস্তগণের অন্ততম প্রধান ব্যক্তির একখানি প্রতিকৃতি পাঠকগণ ইতিপূর্বে দেখিতে পাইয়াছেন ও সেই সঙ্গে সম্পাদক লিখিত ইহার নট-জীবনের ছ এক কথাও পাঠ করিয়াছেন।

১২৭৩ সালের প্রথমেই ইংরাজি ১৮৬৬ খ্রষ্টাব্দের মধ্যমাংশে জোড়াসাঁকোর প্রনামধ্যাত ভূম্যধিকারী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের তবনে তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অংশে তদীয় পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্যোগে ‘জোড়াসাঁকো অবৈতনিক নাট্যসমাজ’ নাম দিয়া এক বিশিষ্ট নাট্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। শোভাবাজার রাজবাটীর প্রাইভেট “থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি”র স্থায় ইহারাও এক কমিটি গঠন করিয়া সম্প্রদায়ের কার্যাদি পরিচালনা করিতেন। সুবিখ্যাত লেখক বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র (টেক্‌চাঁদ ঠাকুর) মহাশয় এই কমিটির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃদ্বয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র কবি ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঠাকুর (প্রিন্স দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও রাধানাথের পৌত্র), শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নীলকমল যুগোপাধ্যায় সমস্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্বে পূর্বে অভিনীত ‘কুবীন-কুল-সর্ব্বর’ ‘বিধবা বিবাহ’ প্রভৃতি নাটকগুলির স্থায় জনসমাজের কল্যাণকর কোনও নূতন নাটকের অভিনয় প্রয়াসী হইয়া ইহারা দেশপূজ্য পণ্ডিত-

কুলচূড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শানুযায়ী দুইশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়া 'নবনাটক' নামক এক নূতন নাটকের পাণ্ডুলিপি সন্মাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় গ্রহণ করেন। এবার ৩ সেই নাট্যকারশ্রেষ্ঠ রামনারায়ণ তর্করত্ন (নাটুকে নারায়ণ) এই নবনাটক রচনা করিয়া পুরস্কৃত হইলেন। ১২৭৩ সালের ২২শে পৌষ ইংরাজি ১৮৬৭ খৃঃ এই জাহ্নুমারী এই 'নবনাটকের' প্রথম অভিনয় হয়। ইহার শেষ অভিনয় নাকি ১২৭৩ সালের ১২ই ফাল্গুন (ইং ১৮৬৭। ২৩শে ফেব্রুয়ারী) আট নয় বার এই নাটকখানির অভিনয় হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের এই নাটক্যভিনয়ের প্রধান প্রধান অভিনেতা এই কয়জন ছিলেন। বাবু অক্ষর কুমার যজ্ঞমদার, গণ্ডিত আনন্দ চন্দ্র বেদান্ত-বাগীশ ও বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি * মহর্ষির পুত্র ও ভ্রাতৃপুত্রগণ একে একে অভিনয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়া এই সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বেই লিখিয়াছি বাবু গোরদাস বসাক মহাশয় জোড়াসাঁকোর এই সম্প্রদায়কে উচ্চ সম্মান দিয়াছেন। এখানে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের কথা শেষ করিব।

"I should not omit to mention here that the sons and nephews of Maharshi Debendra Nath Tagore, already known to fame as a family of geniuses, have been no less distinguished in their endeavours to resuscitate our Hindu Drama. কবিবর যাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ও নাকি এই সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের

* The representations which they gave, from time to time, in their house, and in which they themselves took the parts of actors, could not be surpassed in respect of the excellence of acting, the exquisiteness of music, and the sweetness of the songs."

অন্ততম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বাবু অক্ষয় কুমার মজুমদার সেকালের একজন অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। গৌরদাস বাবু বলেন যে অভিনয়চাতুর্যে অক্ষয় বাবু, বাবু কেশব চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অপেক্ষা কোন অংশে নূন ছিলেন না। (In Babu Akshoy Kumar Mazumdar a Jester of no less distinction than Babu Keshub Chunder Ganguly) জোড়াসাঁকোর এই খ্যাতনামা ঠাকুর বংশ কি সঙ্গীত চর্চায়, কি নাট্যাভিনয়ে ও কি নাট্য সাহিত্যালোচনায় বহুদিন যাবৎ কলিকাতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই মহা শিক্ষিত-বংশের আবালবৃদ্ধবনিতা খাঁর পরিবার সম্বন্ধে নাট্যাভিনয়ে যোগদান করিয়া থাকেন। কবির রবীন্দ্রনাথ, নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির অভিনয়ে, সঙ্গীতে ও নাট্যরচনায় সিদ্ধহস্ত বলিয়া জনসমাজে উচ্চ সম্মানের অধিকারী। তাঁহাদের গুণমুগ্ধ নয় এমন লোক এক জনও নাই বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। গৌরদাস বাবু লিখিয়াছেন,—
“We have in Babu Rabindra Nath Tagore not only a rare actor true to the life, but a songster of superior order and in Babu Jotirindra Nath Tagore a brilliant musician.” অত্যাধিক এই বংশে নাট্যাঙ্গুরাগ সমভাবে বর্তমান। মাঝ মাসের ত্রয়োৎসব উপলক্ষে এখনও ইহাদের ভবনে নাট্যাভিনয় হইয়া থাকে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাটীর ‘নবনাটক’ অভিনয়ের কয়েক মাস পরে ১২৭৪ সালের ৩০শে ভাদ্র, ইংরাজি ১৮৬৭ খ্রিঃ ১৪ই সেপ্টেম্বর, শনিবার বাধা বটতলার খান্দানামা ধনী ৮ জরচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত পরমানন মিত্রের উদ্যোগে, তাঁহাদের পুরাতন বাটী, ৩১৯ নং অগার চিৎপুর রোডস্থিত ভবনে এক সুন্দর নাট্যাভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়। মধুসূদনের ‘পদ্মাবতী’ নাটকই এ যুগে বিশেষ সমাদর লাভ

করে। পঞ্চানন বাবুও এই ‘পদ্মাবতী’ নাটকই অভিনয় করান। বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (স্কুলকায়), মণিমোহন সরকার, জীবনকৃষ্ণ সেন ও শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ যথাক্রমে ‘ইন্দ্রনীল’, ‘সদ্রী’, ‘সারথী’, ‘কল্কী’ ও ‘অন্ধিরা’, ‘বিজয়ক’ ‘কমি’ ও ‘পদ্মাবতী’র ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই বোগ্যতার পরিচয় দিরাছিলেন এইরূপ শুনা যায়। বিহারীলাল বাবুই নাট্য-শিক্ষক ছিলেন। সুবিখ্যাত সঙ্গীত বিহারদ জোয়ালাপ্রসাদ ও সুবাদক নিতাইচক্রবর্তী (বৈষ্ণব) সঙ্গীতাদি শিক্ষাদানে নিযুক্ত ছিলেন। কবিরর মধুসূদন দত্ত মহাশয় স্বয়ং নাকি দু’একটা অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন।

এই সময়ে কলিকাতার নানাস্থানে ও পুরুতলীতে তবানীপুর, শিবপুর প্রভৃতি স্থানে নানা নাট্যাভিনয়ের আয়োজন ও অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তবে এ সকল নাট্য-সম্প্রদায়ের কোনটাই স্থায়ী আকার ধারণ করে নাই। সেই জন্য আমরা তাঁহাদের নামোল্লেখ ও দু’এক কথা মাত্র লিপিবদ্ধ করিব।

চোরবাগানে বাবু কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে Chore-bagan Amateur Theatre নামে এক নাট্যসম্প্রদায় ‘উষা অনিরুদ্ধ’ নাটক অভিনয় করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ংই প্রধান উদ্যোক্তা।

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশের ৬শ্রামলাল ঠাকুর মহাশয়ের দৌহিত্র বাবু হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও ত্যাগবলীন প্রসহন লেখক বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের যত্নে, তাঁহারই রচিত ‘কিছু কিছু বুঝি’ নামক প্রহসন বিশেষের অভিনয় হয়। মহারাজ বতীপ্রমোহন ঠাকুরের বাটীর সেই ‘বুঝে কি না’ ? প্রহসনের উত্তর স্বরূপ এই ‘কিছু কিছু বুঝি’ ? প্রহসনের উদ্ভব। দেশের কবি, পাঁচালী তরঙ্গা ও হাফ-আকড়াই প্রভৃতি সঙ্গীত সংগ্রামের জায় নাট্যাভিনয়েও এই সময়ে

নাট্যসংগ্রাম চলিতে লাগিল। কয়লাহাটায় অর্থাৎ বর্তন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট জোড়াসাঁকোয় হেমেন্দ্র বাবুদিগের বাসিতে এই প্রহসন ধ্যানির কয়েকবার অভিনয় হয়। এই পুস্তকে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় কিছুই ছিল না। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা বিশেষ আবশ্যিক। এই সম্প্রদায়ে আমাদের চিরপ্রিয় রঙ্গরসাবতার হাজার্গাঁও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুক্তকী ও বঙ্গ হারী রঙ্গমঞ্চের প্রথম পীঠাধিপতি ও নিম্নোক্তা ধর্মদাস সুর মহাশয়র অভিনয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্দ্ধেন্দু বাবু 'দস্তবজ' 'মুগ্ধাণ আলি' ও 'চন্দন বিলাস' নামক তিনটি ভূমিকা ও ধর্মদাস বাবু 'চন্দন বিলাস' (জী-ভূমিকা) গ্রহণ করেন। ইহাদের অভিনয় নাকি বেশ ভাল হইয়াছিল। 'বিশ্বকোষ' সংগ্রহ কর্তা বলেন কবিবর যধু-সুন্দর নাকি এই অভিনয় দেখিয়া 'মুক্তিকের বাবা মুক্তিকে' আনন্দ উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠেন। অর্থাৎ অল্প সকলকে নাটী করিল। কিন্তু কবিবরের ঐ চৌকরটীকে কেহ কেহ এরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন যে এই অভিনয় 'নাটী' ছাড়া কিছু নয়, অর্থাৎ ইহা একবারে নাটী হইয়াছে, অভিনয় হয় নাই। কবিবর গিরিশচন্দ্র যেমন পরবর্তী সময়ে "National Theatre" এর 'নীলদর্পণ' অভিনয়কে লজ্জা করিয়া বলিয়া ছিলেন, 'নাগের গোড়ায় দিচ্ছে সার' অর্থাৎ 'নীলদর্পণে' শৌচ ভ্যাগ করিতেছে। 'কিছু কিছু বুঝি'র প্রথম অভিনয় ১২৭৪ সালের ১৭ই কাতিক, শনিবার (২রা নভেম্বর ১৮৬৭)। *

ও দিকে বহুবাজার অঞ্চলে এক নাট্যসমাজ গঠিত হইয়া স্মৃতিবিনোয়নোহন বঙ্গ মহাশয়ের রচিত 'সত্য নাট্যক' ও 'সামান্তিক'*

* বাবু জোড়াসাঁকোয় মুখোপাধ্যায় তখন পাঁচালী তরজার ছড়া ও গালা বাধিতেন, ইতিপূর্বে বিনি 'আগনার মূখ আগনি দেগ' নামে একখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ের প্রহসনসমূহে Slang বা Vulgar বিষয় ও ভাষা অনেক থাকিত।

অভিনীত হয়। মনোমোহন বাবু একজন সুকবি ও নাট্যকার বলিয়া বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত ‘প্রথম পরীক্ষা’ প্রভৃতি অত্রান্ত নাটকাদিও সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। এই ‘প্রথম পরীক্ষা’ নাটকখানি কিছুদিন পূর্বে সুবিখ্যাত Star Theatre এ ও অভিনীত হইয়াছিল। তখন ‘রানান্তিষেক’ নাটকখানি নাকি বহু সমাদর পাইয়াছিল। স্থানে স্থানে এই নাটকখানি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হইত। কোন রহস্তপটু রসিক ব্যক্তি জেব করিয়া এই নাটকখানির ‘বর্ণপরিচয়’ নাটক নাম প্রধান করিয়াছিলেন।

চতুর্থ প্রস্তাবের প্রথমার্শে আমরা পূর্বোল্লিখিত একজন বাদন সম্প্রদায় সমূহের কথা কিছু কিছু আলোচনা করিয়া স্থায়ী নাট্যশালা সমূহের জনক স্বরূপ যে নাট্য-সম্প্রদায় কলিকাতার বাগবাজার গলিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণের সহিত বলীয় সাধারণ স্থায়ী-নাট্যশালা চিরজড়িত রহিয়াছে ও থাকিবে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস দিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রস্তাবান্তরে আমরা কবিকেশরী রামনারায়ণের পর কবিবর নধুসূদন দত্তের সহিত বলীয় নাট্যাভিনয়ের ও নাট্য-রচনার যোগাযোগ ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ

আধুনিক বঙ্গ-নাট্যশালা ।

(শ্রীরাধাকিশোর কর লিখিত)

আজ কাল দেখি সব নৃতন এষ্টার,
বিকট চীৎকার সার ভীষণ হুঙ্কার ।
পায়তারা কসে আর ভুড়িলাফ ধায়,
কি যে বলে মাথা মুণ্ড বোঝা নাহি যায় ।
গ্রীক কি ল্যাটিন কিবা নিজ মাতৃভাষা,
বুঝিবার চেষ্টা করা কেবল ছুয়াশা ।
বাস্তবায়নের মুখে বাংলা বুঝিতে না পারি,
নিজ মনে মনে হয় সরমেতে মরি ।
এষ্টারের মুখ যবে করি নিরীক্ষণ,
নাহি দেখি তাহে কোন ভাবের সুরণ ।
কান্নাছে, কি হাসিছে, কি করিয়াছে জ্ঞোণ,
মুখ দেখি কোনমতে নাহি হয় বোণ ।
ঠিক যেন দেখিতেছি “বিজু থিয়েটার”,
ভেদমাত্র ভুড়িলাফ, হুঙ্কার, চীৎকার ।
কিবা রণে, কি গহনে, কিবা প্রিয়া কাছে,
গলাবাজি লাফালাফি সব তাতে আছে ।
বলিহারী শতবার দর্শক মণ্ডলী,
যত উচ্চ চীৎকার তত করতালি ।
তদ্বৎসর, নৃত্যরঙ্গ—কিবা চমৎকার,
কেমনে বর্ণিব বল কি তার বাহার !

‘সার্কাস’ দেখিতেছি কিবা থিয়েটার,
 পদে পদে এই ভ্রম ঘটে অনিবার ।
 সমগ্র শরীর আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের,
 সুভঙ্গিম সঞ্চালন—লক্ষণ নৃত্যের ।
 আধুনিক নৃত্য এক বিকট ব্যাপার,
 ভাবিয়া না পাই কোথা তুলনা তাহার ।
 দপাদপ্ ধপাদপ্ নাচের কি দাপ,
 ধূলায় আধার সব—একি হল বাপ ।
 সমুখ আসনে বসে হেন সাধ্য কার,
 তিলমাত্র নাকের কুমাণ খোলা ভার ।
 ডাঙেল ভাঁজে কেহ, কেহ ঘুঘি ছোড়ে,
 লাক দিয়া ওঠে কেহ অগরের বাড়ে ।
 কভু ওঠে, কভু বসে, কখনও শয়ন,
 কুস্তির কসরৎ কভু, কভু বা লক্ষন ।
 ক্ষুর জীব আমি কিবা করিব বর্ণন,
 সার্কাস থিয়েটার একত্রে মিলন ।
 একত্রেও ক্রটি নাই—ঘন করতালি,
 উপরন্তু কুলমালা, তোড়া দেয় ডালি ।

নিবেদন

কলা-বিজ্ঞা শিখিবার প্রধান মন্দির,
 তার অধোগতি দেখি হয়েছি অস্থির ।
 গ্রাণের আবেগে তাই দুকথা বণিহু,
 আরও বলিবার আছে—ভয়ে সঘরিহু ।

স্বতঃ ক্রোড়ে নানাপ্রকার-কর্তৃপক্ষদ্বন্দ্ব,
বড় হুগ্গে এ কাহিনী কাঁচলু বর্ণন ।
ইতি মধ্যে পরে যদি না খাই এছাত,
প্রকাশিত আশ্রয় বাহা আছে বলিবার ।

বিলাতি রঞ্জিনী ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর ।)

(শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ।)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

তখন প্রভাত হইয়াছে ।

দুর্জাভঙ্গে ঘেরিয়াস দেখিল,—দম্পত্যবিরতা হইয়া সে বাড়ীতে বসিনী ।

ভয়ে ও বিষয়ে কীপকণ্ঠে বলিল, “আমি কোথায় ? আমাকে তোমরা কোথায় লইয়া যাইতেছ ?” এই বলিয়া অজ্ঞানিনী জোর করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু পারিল না, আবার বসিয়া পড়িল । পরে বুঝিতে পারিল সে ভীষণ বন্ধনে তাহার হস্তপদ আবদ্ধ ।

দম্পত্যদ্বয়ের মধ্যে একজন হাসিয়া বলিল, “তুমি একজন লজ্জনে আছ সুন্দরী ! আমরা তোমাকে তোমারই বসন্ত বাড়ীতে নিয়ে যাইছি ।” এই বলিয়া দম্পত্য আরও বিকট হাস্য করিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে অপর দম্পত্যদ্বন্দ্ব তাহার শ্বেত উচ্চহাতে ঘোষণা করিল ।

দল্লাগণের বিকট ছাড়ে মেরিয়ালের দেহের রক্ত যেন শুকাইয়া গেল! অবলা রথী কেমন করিয়া এই ভয়ঙ্কর দল্লুকবল হইতে আত্মরক্ষা করিবে, তাহারও কিছু উপায় ঠাওরাইতে পারিল না। তাহাদের ভীষণ আক্রান্ত, কর্কশ কণ্ঠস্বর, হিংস্র পশুর জায় অচরণ, সহস্রের ভিতর দিয়া নির্ভয়ে নিঃসফোটে গমন এবং নিজের নিঃসহায় অবস্থা দেখিয়া মেরিয়াস জীবনৈব আশা হ্রদের মতন প্রতিভাগ করিল। গাড়ী তখন ওয়েষ্টমিনিস্টার স্ট্রোকের উপর বিরা অতি দ্রুত বেগে চলিতেছে।

সাহসে ভর করিয়া মেরিয়াস প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল—
তাঁহার চীৎকার-ধ্বনি শুনিয়া দল্লাগণ শকট-চালককে আরও দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইতে বলিল। আদেশ মত অথ বেন অসংযত ভাবে ছুটিতে লাগিল।

মেরিয়াস তথাপি তারসরে চীৎকার করিতে লাগিল। চীৎকার শুনিয়া একজন পবিক এবং একজন পুলিশের কর্মচারী গাড়ীর ভিতর কোনরূপ দন্দ বাপার সংঘটিত হইতেছে, এইরূপ সন্দেহ করিয়া ওয়েষ্ট-মিনিস্টার এভিনিউ সমুখে গাড়ী ছোর করিয়া থামাইলেন। গাড়ী থামাইতেই তাহার চারি ধারে পথের লোক জন দাঁড়াইয়া গেল।

পুলিস কর্মচারী শকটচালককে জিজ্ঞাসা করিল—“এ গাড়ী কোথা থেকে আসছে? এত জোরে তুমি হাঁকাইতেছে কেন? গাড়ীতে কে চীৎকার করছে?”

শকট চালক বলিল—“জুজু। গাড়ীর ভিতরে তাহার আছেন তাহাদের জিজ্ঞাসা করুন,—আমি কিছুই বলিতে পারিব না। সমস্ত রাত্রি সকলে নাতাল হয়ে গাড়ীতে হুলা করেছে—এত বেলা হ’ল তবু গাড়ী ছাড়ছে না। আমি বহা বিপদে পড়েছি—আমাকে আপনারা রেহাই দিবে দিন।”

“গাড়ীতে জীপোকটা চীৎকার কচ্ছে কে?” দৃষ্টিগণকে সতর্কতায়
করিয়া পুলিশ কর্মচারী পুনরায় একথা জিজ্ঞাসা করিল। একজন অল্প
বয়স্ক মহিলা অস্বাভাবিক স্বরে বলিল—“হুজুর ইনি আমার জী। ইনি মনে
করেছেন যে আমি একে ভাণ্ড করে পালিয়ে যাবি—জীই
শিরহেব হয়ে থাকুক। তবে চীৎকার কচ্ছেন। আর এরা হল আমার
জী। তাই অর্থাৎ আমার সমস্ত গাড়ীতে বসে আমোদ করে এক
আল পাত্রে টানছেন বটে—কিন্তু কেউ বেটিক হুন্নি। সকলেই
বেশ বাড়ি আছেন।”

কথা শুনিয়া পুলিশ কর্মচারী আর কিছুকি না করিয়া সে স্থান
পরিভ্রমণ করিল—সঙ্গে সঙ্গে পর্যবেক্ষণ যে বাহ্যিক গন্তব্য আভিহুকে
প্রত্যক্ষ করিল। গাড়ী ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। নানা বস্তু
স্থানে ফিরিয়া ফিরিয়া—অনেকটা পল অতিক্রম করিয়া গাড়ীখানি
শেষে পাঁচ দীর্ঘ জাকাতের আড়াল উপস্থিত হইল।

অভাগিনী মেরিয়াসের প্রদর্শন কথা আর করিয়া করিবার নয়।
তবে তাহার বাক্যের বহুভাষ্য, চীৎকারে কণ্ঠের ভয় হইয়া গিয়াছে।
আশ্রয় অন্বেষণ উপর নির্ভর করিয়া ভ্রমণী নীরব হইয়া রহিল।
দৃষ্টিগণ তাহাকে লটকা সেই আড়ালে প্রবেশ করিল। এইবার
মুক্তাবারে উপনীত হইয়াছে মনে করিয়া তবু মেরিয়াসের সূক্ষ্ম
সংজ্ঞাশীল হইল।

জান হইলে মেরিয়াস চক্ষু চাহিয়া দেখিল একটা অস্বাভাবিক
অভিক্রম কুটিলভাষ্যের তদন্তের তাহাকে শয়ন করাইয়া রাখিয়াছে।
কোণে একটা দীর্ঘ দিটু মিটু করিয়া অস্বাভাবিক কুটিলে অতি অল্পট
আলোক প্রকাশ করিতেছে।

কোণের সে?—অবিদ্যা চিত্তিয়া মেরিয়ান্ কিছুই বুঝিতে পারিল
না—এ কোন স্থান?

পূর্বসন্ধ্যার ঘটনাবলী একে একে অভাগিনীর স্মৃতিপথে উদ্ভব হইতে লাগিল। মেরিয়াস একবার গাত্রোধান করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু দায়! দেহ বড় দুর্বল—অভাগিনী কিছুতেই উঠিয়া বসিতে পারিল না—মাথা ঘুরিতে লাগিল,—মেরিয়াস সেই তৃণবায়ার উপরে শুইয়া পড়িল। কিছুকাল পরে অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া অভাগিনী বিকট সদস্যযুগ্ম দর্শন করিতে লাগিল। আর এক ঘণ্টা পরে কুতীরের চানি পুলিশ কে যেন ভিতরে প্রবেশ করিল।

নিদ্রাগোশুন দীপের অস্পষ্ট আলোকে মেরিয়াস লোভীকৈ চিনিতে পারিল না—কিন্তু বুঝিল যে দস্যবলের কেহ একজন হইবে।

কর্কশ কণ্ঠে আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল—“জেনে আছে কি?”

“হা! আছি।” কণ্ঠকণ্ঠে মেরিয়াস উত্তর করিল। তবে তবু পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—“তুমি কে? কি চাও?”

“আমি কি চাই—দুকথার বলছি! আমি কে? চেরে দেখ! এই বলিয়া সে ব্যক্তি আলোটা লইয়া নিজের বিকট মুখের সম্মুখে হরিল।

“তুমি সেই সর্দার?” মেরিয়াস বলিয়া উঠিল।

“হ্যা! আমিই সেই বটে। তুমি বেশী গল্পগোশ করোনা—তোমাকে কিছুকাল আটক করে রাখব—”

“কিছুকাল? সে কি? কতদিন?”

“তা আমি না।”

“কেন তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এলে? তোমরা কেন অধিকারে আমাকে আটক করে রাখ?”

“প্রাণের বাণে!” এই বলিয়া দস্যবর্দার পুনরায় কুতীরের চানি বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল।

হয়োদ্য পৰিচ্ছেদ।

এতদ্ব্যবস্থার কারণে দস্তামদার মেরিয়ালকে তথ্য প্রাপ্ত
ধারণোপযোগী আতি জবস্ত দাত্য দিয়া হইত। একদা খাচা বাড়িতে
মেরিয়ালের যেন প্রাণ বাধির হইবার উপক্রম হইত—উদগার উঠিত।
কিন্তু কবচঃ সুর্য্যর ত্যাগনার আর সে ভাব রহিল না। অগত্যা শেষ
কদম্বী আহাৰই পলায়ন করিতে হইত।

দস্তামদার মেরিয়ালের কোন কথার জবাব দিত না। মেরিয়াল
তাহাকে কত বিনতি করিত—তাহার পারে ধারণা ভিজ্ঞান করিত
—“কি আপনারে আমার এমন শান্তি”—কিন্তু পাবাবস্থার দস্তা
কিছুতেই বিচলিত হইত না।

মেরিয়াল দ্বির করিতে পারিল না—কত দিন বন্দিনী হইয়া
আছে। মোটামুটি হিসাব করিয়া বুঝিল—অল্পতঃ এক পক্ষের কম নয়।

মেরিয়াল জাবিল—“ভিজ্ঞান কি মনে করিবে? আমার
প্রতি তাঁহার কি ধারণা হইবে? আর কি তিনি আমাকে কবচ হস্ত
দিবেন? হয়তো কণ্ঠজিনী—বারবণিতা বিনেচনা করিয়া জ্বরের
হস্তন আনার স্থিতি তাঁহার হস্ত হইতে বিলুপ্ত করিবেন।”

না—না। মেরিয়াল একদা কুচিন্তা কখনও হস্তে স্থান দিতে
পারে না। ভিজ্ঞান তাহাকে পরিত্যাগ করিবে—একথা মনে
হইলেও তাহাকে শত রুশিক যেন দংশন করে। এ ছতাবনা মেরি-
য়ালের সুস্থ্যবরণ।

মেরিয়াল তাবিত্তে জাগিল—“আমি যেমন করিয়া পারি
ভিজ্ঞানসের কাছে ছুটিয়া যাব। তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে
নমস্কার ব্যাপীত বুকাইয়া বলিয়া তাঁহার হস্তের কুলদেহ দূর করিব।
যেমন করিয়া পারি তাঁহাকে বুকাইব—আমি কলধিনী নই—আমি
সতী।

কিছু কেমল করিবার বা রক্ষা পাওবে? এট ভাবণ অসম্ভব—
কাটাগার হইতে মেরিয়াসের পলায়নের পথই বা কোথায়? কিসে
অভাগিনী মুক্তিলাভ করিবে? এট সমস্ত দুশ্চিন্তার তাৎকালিক
আরও আশ্রয় করিয়া তুলিল। অভাগিনী মনে মনে নানারূপ
উপায় উদ্ভাবন করিতে ও চেষ্টা করিতে উপায় অবলম্বনের চেষ্টা
করিতে লাগিল—কিন্তু কোনটাই ফলদায়ক হইতে পারে বোধ
হইল না। অবশেষে অদূরদেবী একটু সুপ্রসঙ্গ হইলেন। মেরিয়াসের
ভগ্নদ্বারে একটা কীণ আশ্রয় সন্ধান হইল। মেরিয়াস দেখিল সেই
পুত্রাতন কুটীরস্থানির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কুটীরের প্রাচীরগুলি
সমস্তই ভগ্নপ্রায়—কোন একমে খুঁটিও লাগিয়াছে। সেগুলি বাঁধা হইয়া
নাই। তাহার একপার্শ্বে একখানি ভগ্ন ভগ্নাবারী পড়িয়া আছে
দেখিয়া মেরিয়াস তাহার সাহায্যে—শেষ কাটাগার হইতে আশ্রয়
মুক্তিলাভ প্রভূত করিয়া লইবার উদ্ভোগ করিতে লাগিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রাস্তাসদার ঠিক নির্দিষ্ট গন্তব্যে তাহাকে
পূর্বের দ্বার আবার দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মেরিয়াস সুযোগ বুঝিয়া
সেই ভগ্নভগ্নাবারীর সাহায্যে কুটীরের প্রাচীরে একটা মনুষ্য যাতায়াতের
উপযোগী ছিদ্র প্রস্তুত করিল। সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া মজুক বাহির
করিয়া মেরিয়াস দেখিল বিকট অন্ধকার, বাহিরে কিছু দেখা যায় না।
তখন ঘীরে ঘীরে সেই কুটীরভ্যন্তরস্থিত কীণ দীপালোকটা আনিয়া
পুনরায় ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে লক্ষ্য করিল। দেখিল
কুটীরের ধার দিয়া এক ভীষণ পয়ঃপ্রণালী প্রবাহিত। পুত্রাতন যত
আবর্জনা এবং অপরিষ্কার জল সেই পয়ঃপ্রণালী দিয়া প্রবাহিত হইয়া
বরাবর দক্ষিণদিকে চলিয়াছে। মেরিয়াস অগ্রবানে যুগিল—ইহা
নিশ্চয় টেম্‌স্‌ নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। গন্তব্য না দেখিয়া ঈর্ষের
উপর আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণের বায়ে অভাগিনী ঘীরে ঘীরে সেই

ভূগঙ্গার পরঃপ্রণালীতে অবতরণ করিল। হিংসের উপর বিপদ। অত্যাগিনীর—কোন দিকেই নিজার নাই। সেই পরঃপ্রণালীতে অসংখ্য মুখিক বাস করিত। তাহারা মেরিয়াসকে শত্রু বিবেচনা করিয়া সবলে তাহাকে আক্রমণ পূর্বক দংশন করিতে আরম্ভ করিল। মেরিয়াস ববাসাধা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে—জলের স্রোতান্ত-মুখে আগ্রসর হইতে লাগিল। কতদূর—কতদূর সেই অবস্থায় চলিতে লাগিল; ভূগঙ্গে আশ্রয়স্থান—মুখিক দংশনে সর্বদা অতবিকৃত—পরঃপ্রণালী হইতে উপরে উঠিবার কোন উপায় নাই। চতুর্দিকে কেবল বিকট অন্ধকার। মেরিয়াস বুকিল মুহূর্ত্ত নিশ্চিত।

অলসভাবে মেরিয়াস তাহার ভিতরে একস্থানে একটা বড় পাথর দেখিল—তাহার উপরে বসিয়া বিশ্রামলাভ করিতে লাগিল। এমন অবস্থায় তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইতেছিল তাহা সচক্ষে অনুমান করা যায়। মেরিয়াস ভাবিল—যদি কোন কারণে পরঃপ্রণালী জলোপরিপূর্ণ হয়—ভাড়া হইলে স্তম্ভধার তাহার মৃত্যু হইবে—কিন্তু সেই আর প্রাণরক্ষা হওয়া সম্ভব নয়। কতকাল এইভাবে মেরিয়াস বসিয়া রহিল—ভাড়া সে বলিতে পারে না। কারণ আন্দোলনের বিষয় এই যে, এই ভাষণ বিপদসঙ্কুল স্থানে—এই মুহূর্ত্তে স্বাভাবিক ভাষণ তলায়তন হইতেছিল। পরঃপ্রণালীর উপরিভাগে স্থানে স্থানে বাদু স্বাভাবিকের অল্প কঁকরি ছিল; তাহারই মধ্যে দিয়া মেরিয়াস এক একবার আকাশের দৃষ্টি একটী ভাড়া দেখিতে পাইতেছিল। অতঃপর মেরিয়াস দেখিল কঁকরির ভিতর দিয়া প্রত্যাহার কর প্রবেশ করিয়া পরঃপ্রণালীর সেই ভীষণ অন্ধকার বিদূরিত করিল। অত্যাগিনীর মুক্তদেহে যেন জীবন সঞ্চার হইল—আবার বাঁচিবার আশা হইল। মেরিয়াস পর শুদ্ধিতে পাইল—এবং বুকিতে পারিল—পরঃপ্রণালীর উপর দিয়া অসংখ্য বহুমুখ—গাড়ী ঘোড়া

চলিতেছে। সাহায্যের প্রত্যাশায় সে প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিল—কিছু হার—অথবা প্রবলীকণ্ঠের সহঃ জীব চীৎকারকানি পরঃপ্রাণীপ্রবাহিত জনজ্যোতের সহিত নিশিয়া রহিল—তাহার বাহিরে আর পৌঁছল না। কি সন্ধান! এ আবার কি! পরঃপ্রাণীপ্রাণ জল যে ক্রমশঃ গভীর হইতেছে। তবে কি মেরিয়াস যাহা আশঙ্কা করিতেছিল তাহাই হইল? হাঁ—তাহাই বটে। জীবন ধূমে প্রতি মুহূর্তে জনজ্যোত নতীরতর হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। মেরিয়াসের অবসর দেখ তাহার বেগ আর সঙ্ক করিতে পারিল না—অবশেষে সেই জীবনজ্যোতের মুখে আত্মসমর্পণ করিয়া কোন প্রকারে জলের উপরে মাথা রাখিয়া মেরিয়াস ভাসিয়া বাইতে লাগিল।

এইভাবে ভাসিতে ভাসিতে শেষে এক কাঁটখণ্ড সম্মুখে পাইয়া তাহারই উপর তর করিয়া ভাসিয়া বাইতে লাগিল। কিছুকাল পরে একটি জীবন তরঙ্গ আগিয়া তাহাকে যেন আছড়াইয়া কিছুদূরে ফেলিয়া দিল। মেরিয়াস একবার চক্ষু চাহিয়া দেখিল সে পরঃপ্রাণী হইতে বর্ণিত হইয়া জীবন তরঙ্গসমাকুল নদীগর্ভে নিপতিত হইয়াছে। পরঃক্ষণেই তাহার চীৎকার করিয়া মেরিয়াস কাঁটখণ্ড হইতে বিচ্যুত হইয়া নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইল।

(ক্রমশঃ)

বিলাপে প্রলাপ ।

(শ্রীকৃষ্ণগোপাল যেন লিখিত ।)

১

কেন রে পাগল মন এত বিচঞ্চল ।
বেকে থেকে কেন হেব হতেছ বিচল ?
কি বেরনা তুমি বল,
অকস্মাৎ উপজিল,
ব্যথার উপরে ব্যথা বাড়ান কেবল !
কেমনে না জানি হায় ! হইবে লীতল !

২

ছিল মন একতালে হইয়া বিচোর !
কে তারে হরিয়া নিল কাটি মনডোর ।
প্রতিপদে ভাবি ভাই,
ভাবিয়া নাহিক পাই,
না জানি কোথায় বেলে পাব মনচোর !
সুধনিশি বল মন কে করিল ভোর !

৩

রাজি নাই—দিবা নাই—শয়নে স্বপনে ।
আছি নার হ'য়ে ভোর না জানি কি ধ্যানে !
নিজনে সে বুঝশী,
কেন দেখা দেয় হাসি,
কেন রঙ্গ করে পশি এ পোড়া পরাপে ?
পারিথ বুঝিতে কি সে চিত্ত এ জীবনে ?

৪

কুস্ত্র জ্বালালে হবে বসাই তাহার ।
 কি সুখানন্দুর জ্বোতে তাসার আদার ।
 নিজা আশি চণি যায়,
 কিছু প্রাণ বাহি চায়,
 কেবল সমস্ত স্থতি বুদ্ধিরা বেড়ায় ।
 কি যেন অজানা পথে টেনে নিয়ে যায় ।

৫

পবিত্র অশ্রুপাশে শুধু তার দুঃখ ।
 মনে মনে স্মৃতি তারে করি অবিস্মরণ ।
 প্রেমের কোমল পাশে,
 বাধ তারে বৃদ্ধ হেসে,
 স্মৃতিয়া সে সুখখানি কাটাব জীবন ।
 বিহুপদে আপনারে করিয়া অর্পণ ।।

মেহের-উল-নিসা ।

(শ্রীহরিসাধন সুখোপাধ্যায় লিখিত ।)

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

দৃষ্টিকলটে ব্যক্তির জায়, আলামর দেহে সাহজাদা খেনিম নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন । সমস্ত জগত তাঁহার চক্ষে যেন অধিপূর্ণ বদ্রিয়া বোধ হইতে লাগিল । তাঁহার অন্তরে বাহিরে ভয়ানক জালা । সে আলার সহিত কিসের তুলনা কেওয়া ধাইতে পারে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত তিনি নিজেই বলিতে পারিতেন না ।

রজনীর বিধাম উত্তীর্ণ । কারিদিকে নিস্তব্ধতা । সেবাজী গাধুর-প্রাণে একটু সুখের আশায় আলামর প্রাণকে একটু সুখীভূত করিবার জন্ত, তিনি প্রথমঘায়ে পদ্মীর কক্ষে গিয়াছিলেন । কিন্তু সেখানে শান্তি পানরা ঘুরে পাক—আবার শব্দগুণে প্রবলজালা গইয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলেন । তাঁহার দ্রুতদিক্ত জ্ঞেদপরিচালিত, স্মৃচ্চ পুরক্ষেপে কক্ষতল বিস্তারিত কোমল বশোরার গালিচার উন্নত বন্ধ যেন বেশী করিয়া গুইয়া পড়িতে লাগিল ।

সেলিম উত্তেজিতভাবে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, সঙ্কেতবস্তীর বর্ণ-শৃঙ্খলসংযুক্ত মূল, সবধে আকর্ষণ করিলেন । বাহিরের প্রস্তরযুক্ত লালানে, তিনজন খোজা অর্ধনিদ্রিত অবস্থার তুলিতেছিল । তাহাদের তিনজনই সেই দণ্টানিমায়ে চমকিত হইয়া সাহজাদার কক্ষের দিকে দৌড়িল ।

যে আগে ককে প্রবেশ করিয়া কুণীস করিল, তাহার নাম ওসমান। সেলিম তাহাকে মৃত্যুস্তম্ভে আনিতে বেধিয়ারি কোষেতে চতুর্ভুক্ত উপানৎ কুণীয়া ছুড়িয়া য়ারিলেন। পক্ষোদে বলিলেন—
“বান্ধার বাজা! আমি সাতিকে ডাকিয়াছিলাম—তুই আসিলি কেন?”

এগের ভর সকলেরই আছে। দীন-হুনিয়ার মালিক, আকবরসার আকবরের পুত্র, হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সম্রাট—সাহ সেলিমের, বহুধচিত উপানৎপ্রহার ত পুণ্যহারের অপেক্ষাত কোমল। খোজা ওসমান সেই উপানৎ কুড়াইয়া লইয়া সেলিমের পায়ে পরাইয়া দিল।

সেলিম একটু শাস্তভাব ধারণ করিয়া বলিলেন—“সংবধান! অপর কখনও যেন সাক্ষি না হয়। যা—এখন গিয়া কুণীয়া বীধীকে ধর দে। সে যেন বুঝ ঠাট্টা সেলামী লইয়া আসে।”

সে যাত্রা যে কোতলের চকুম হইল না, বা কুস্তার মুখে বাইতে হইল না—এই ভাবিয়া খোজাসাহেব নসীবকে বুঝ জবর মনে করিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

সেলিম এক পল্লবপুঞ্জিনির্মিত, মনমল যন্তিত, যথিযচিত, চ্যুতিমর আসনে বসিয়া কবলহুকপোলে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। তাহার বস্ত রাগ মানসিংঘের উপর পড়িল। মানসিংহ তাহার পত্নীর পত্র দেখিবার কে? যদিই বা দেখিল—সে পত্র ছিড়িবার অধিকার তাহাকে কে দিল। সেলিম প্রতিজ্ঞাবান্ধক অশ্রুতধরে বলিলেন—
“মানসিংহ! একদিন তোমার এ দুঃস্তার ফল ভোগ করিতে হইবে।”

কেন যে এত আশঙ্কা করিল, তাহা প্রায়শ্চাত্ত একটু বুঝাইয়া বলিল। যোধাবাই, পূর্বে রাতে অস্তর যথিবার লজ্জা অহুন্নোদ করিয়া, এক বরিতা পাঠাইয়াছিলেন। এ পত্রখানি তাহারই উত্তর।

পত্রে যোধাবাইয়ের প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা দেখান হইয়াছিল,

আর তাহার উপর মানসিংহের অধেষ্ট নিলান্ড ছিল। তদুপরি কবরে বাইনার অল্পমতি ও তাহাতে ছিল না।

চিতোর জয়ের পর হইতেই সেলিম ও মানসিংহের মনে অসন্তোষের সূত্রপাত হয়। মহারাণা প্রতাপসিংহের অভিশাপ যেন হাতে হাতে ফলিল। রাজপুত্র হইয়া রাজপুত্রের স্বাধীনতা পরসে করিল, মানসিংহ যে পাপ করিয়াছিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

এ মনান্তরেণ প্রধান কারণ বুদ্ধজর। আকবর সাহেব মনের বিশ্বাস, চিতোর বিজয়ে, রাণা প্রতাপের অপরাজিত সাধনের যে কিছু পৌরব লবষ্ট—মানসিংহের। সেলিম মনে মনে ভাবিতেন—তিনি সেনাপতি হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই যুদ্ধ জয় হইয়াছিল। কিন্তু এ বিশ্বাসের ফিচার কণ্ঠী যথং দিল্লীস্থর।

যে দিন দিল্লীখর আকবরসাহ, প্রকাশ আম-বরবারে মানসিংহের গলদেখে, চিতোরজয়ের পুরস্কারস্বরূপ এক বহুশূল্য হীৰক-বতিত অসি মানসিংহকে উপহার দিলেন, আর সেলিমকে—বহুশূল্য রত্নখণ্ড দ্বারা সম্মানিত করিলেন—সেইদিন হইতেই সেলিমের মনে মানসিংহের প্রতি বিরাগ জাপিয়া উঠিল।

মানসিংহ সেলিমের ব্যাঘ্রহায়ে ক্রমশঃ বুদ্ধিতে পারিলেন—যে বাদ-সাহ-পুত্র, তাহার এই অঘাচিত সম্মানে অতিশয় মর্গল্যথা পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি সেলিমের নিকট আত্মীয়—ভ্রাতৃক। তাহার পিতা আকবরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, য লম করিয়াছেন তাহা সংশোধনের আর কোন উপায়ই নাই। কিন্তু দেহময়ী ভ্রাতৃ যোধ—আর তাহার একমাত্র পুত্র ধনুজর মুখ চাছিল, তিনি সেলিমের এ উপেক্ষায়, মনের আবে চাপিয়া রাপিয়া উপেক্ষাই দেখাইতে লাগিলেন।

কিন্তু, সেলিম মনে মনে আরস্তের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যী বোধাবাইয়ের

প্রতি অসুস্থ হইলেও, মানসিংহের সম্মুখে একপূর্ণ ভাবপ্রকাশ করিতেন যেন—যোধাবাই তাঁহার অবসারই বড়, কারণ বাসসিংহের রংমহালায় সুন্দরীর অভাব নাই। সম্রাট-পুত্র, ভবিষ্যৎ সম্রাট, বাহ্যকে ভাল মানসিংহ, যাহাকে আমার বলিয়া বুকে তুলিয়া লইবেন—সেই তাঁর মাহারী।

সেলিম যোধাবাইএর পত্রের উত্তরে বাহা লিখিয়াছিলেন—তাহাতে যোধাবাইয়ের প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম, অসুস্থ ভাববাসাই প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে সেই পত্রে, তিনি মানসিংহের অনেক নিন্দা করিয়া পরীক্ষা বুঝাইয়াছিলেন—যে অঙ্করে, তাঁহার শত্রু মানসিংহের আশ্রয়ে থাকে—সম্রাট পুত্রবধূ যোধাবাইয়ের শদোচিত কণ্ঠব্য নহে।

মানসিংহের হাতে সেই পত্রই পড়িয়াছে। সেলিম এ পর্যন্ত, অকিবর মাহের ভয়েই হটক, বা সে কারণেই হটক—একাত্তরত্বে কোনস্থানে সম্রাটের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ মানসিংহের কোন নিন্দাবাদই করেন নাই। কিন্তু যোধাবাইকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বামীর মনোভাব বাহাই হটক না কেন, তাহা প্রকাশের আশঙ্কা ত সতীসাতী পত্নীর কাছে থাকিতে পারে না। আর মানসিংহ অথবা কোকিলরূপে সেই পত্র পাঠ করিয়া ভয়ানক ভ্রম করিয়াছিলেন। সেই ভ্রমের ফলে ভবিষ্যতে নামা অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছিল।

চোবের উপর রাগ করিয়া, কেহ মামীতে ভাত বাড়িয়া যায় না। কিন্তু সেলিমের সমস্ত জ্ঞান, মানসিংহ হইতে যোধাবাইএর উপর পৌঁছিল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—আর কখনও যোধাবাইয়ের মুখ দর্শন করিবেন না! হায়! বুদ্ধিহীন সেলিম—ভুলি করিলে কি ? শান্তি সরোবর ত্যাগ করিয়া কেন তুর্গি বেছুর মরুভূমিতে প্রবেশ করিলে ?

সেলিমের সেই অল্পতাপদ্য, নিরাশাঘোতপ্রাণিত, অল্পশোচনা পরিতপ্ত আত্মনানি সম্পূরিত, প্রাণের সজ্জ বাপিরা সেই সময়ে আর একটা রূপের ছায়া পড়িল। সে রূপ—মেহেরউল্লিসার।

সেলিম তখন দেখিলেন—যে তিনি দাবরত প্রাণ বইয়া শান্তি সরোবরের কুলে জাসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সেই সরোবরে আশা-সমীর বিজ্ঞালে, কেবল একটীমাত্র রূপগৌরবধরী ফুলনলিনী ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুহূর্ত্ত বিকল্পিত, তরঙ্গরাগিময় সুনীল সলিলের মত আন্দোলনে—সেই অফুরন্ত রূপ-গৌরব-শালিনী ফুলনলিনী, ধীরে ধীরে কাঁপিতেছে। সেলিমের ফলনাতক্ষু খেল কি এক মোহময় সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে অল্পপ্রাণিত হইল। সেলিম সেই সালিলবক্ষে ভাবমায়া, মলিনীভে মেহেরের অনিন্দ্য রূপের জ্যোতি দেখিতে পাইল। হায়! হায়! সেই ফুলনলিনীর অবরবেও এতোক সৌন্দর্যই যে মেহেরউল্লিসার।

সেই প্রস্তুতিত বলসমূহ যেন তাহার মেজের ছায়া। সেই সর্বল রূপে যেন তাহার হাসির জ্যোতিঃ। সেই মুহূর্ত্তলয় বিকল্পিত নবুরান্দোলনে, যেন তাহার বীণগতি-সজ্জাত, অঙ্গের ক্ষিপ্ৰবৃত্তিসজ্জাত, মুহূ আন্দোলন। সেই নলিনীর আরক্ত অর্ধবৃত্তিত অর্ধ-বিক্ষিপ্তিত বলসমূহে, তাহার মুখের সজ্জ ভাব। যেন সেই মুহূর্ত্তকায়িত পুনঃ শান্ত-মলিনবন্ধ-প্ৰোভিত, মুহূমুহুর মলরান্দোলিত, সুবালিনী অথবা মলরা বলিতেছে—“লাহজাদা। এই ক্ষণে জাসিয়া জাসিয়াই কি আমরা এ অফুরন্ত সৌন্দর্য্য কালের কঠোররঞ্জে বিচূর্ণ হইবে। এলগাত্তে কি রূপের বিচারক নাই, প্রেমের প্রতিদান নাই, ভালবাসার আত্মসমর্পণ নাই। সবই কি নিষ্ঠুর! তা না হয় যেন সাধারণ মানুষে নিষ্ঠুর হইল, কিন্তু তুমি ত ভাগ্যকলে বাবসাহেব বংশে জন্মগ্রহণ। কোনরকম কি একটু বিবেচনা নাই। তুমিও কি নিষ্ঠুর হইবে?”

উদ্ভাসিত হিলে, ভবিষ্যৎ সুখের উদ্ভাসিত শক্তিতে, মর্দজাপার অবসানে, সেলিম এই কল্পনার সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন, এমন সময়ে জুলিয়া স্বর্ণাধারে পূর্ণ ভূষিত গৌলাপবাসিত, সেরাজী হাতে লইয়া সেই কক্ষদ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া, মধুর কণ্ঠে ডাকিল—“সাহজাদা!”

সাহজাদা, চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—“কে তুমি? যেহেতু?”

জুলিয়া তাহার রক্তোৎকৃষ্ট অধরে মুদ্র হাসির লহর জুলিয়া বলিল—
“না জ্ঞানাব! এত ভাণ্য আমি করিয়া আসি নাই। আমি সাহজাদার হাবির খাদী নারীর অধন জুলিয়া।”

সেলিম বিমর্ষপরে বলিলেন “জুলিয়া! জুলিয়া! আমার প্রাণ যে মাঝখানে পড়িতেছে—সবর যে বজের তীব্র জ্যোতিতে জলিয়া যাউতেছে।”

জুলিয়া আবার সেই রক্তোৎকৃষ্ট ওষ্ঠাধরে হাসির লহর জুলিয়া বলিল—“সব ঠাণ্ডা হইবে ছকুরালি। এই সেরাজী—আপনার প্রাণের লুকন আঁচা মিটাইবে। জ্ঞানাবের আদেশে এ বাদী—গৌলাপবাসিত হিলে সেরাজী আনিয়াছে।

সেলিম, সেই স্বর্ণপাত্র গ্রহণ করিয়া ওষ্ঠাধরের নিকটে আনিবেন।
বলিলেন—সে সেরাজির ছাণ অতি সুন্দর! তাহার স্পর্শ, ভূষিত নিম্নে অতি দীপ্ত। তাহার প্রাণ আগুনে জলিয়া যাউতেছে। তিন আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সেই ভূষিত সেরাজী গলাধারণ করিয়া বলিলেন—“জুলিয়া! জুলিয়া! আমার দ্বাও।”

জুলিয়া আবার একটু অগ্রসর হইয়া, আরও একটু মধুর হাসি হাসিয়া, সেই কক্ষদ্বারদ্বার সন্দর ঢেকে, আবার একটু বিহ্বলতা প্রকাশ করিয়া, সেই স্বর্ণ ভূষিত হাবির জ্বলিত সেরাজী ঢালিয়া—সাহজাদাকে দিল। সাহজাদা সেলিম, বিনাবাক্যব্যয়ে, সেই মৃত্যুজয়ঙ্গম গলাধারণ করিলেন।

জুলিয়া আবার বৃহ-হাসির লহর জুলিয়া বলিল “জনাব! আর দিব কি?”

সেলিমের চিত্ত তখন সেরাজীর প্রদানে, অতি উল্লাস, অতি প্রেরণ।

প্রাণের সেই গর্জনশীল দাবানল আলা যেন মস্তকম্বে সরিয়া গেল! প্রাণের চারিধার ব্যাপিয়া, ভীমগর্জনে যে আশ্রয়ের হলুকা উঠিতেছিল তাহা যেন বৃহত্ত মথো নিভিয়া গেল! মকত্বমির মত, রসহীন, তেলোহীন প্রাণ যেন কি এক অস্বাভাবিক ময়ে সজীব হইয়া উঠিল।

সেলিম আনন্দোজ্জ্বলপূর্ণ মুখে ডাকিলেন—“জুলিয়া!”

জুলিয়া হস্তযুগে বলিল—“কেন সাহজাদা!”

সেলিম। রহনী মাজেই কি এত নির্ভর।

জুলিয়া। এ আত্মা করিতেছেন কেন।

সেলিম। তুমি ওখানে দাঁড়াইয়া কেন।

জুলিয়া। আমি সাহজাদার বাদী মাজ।

সেলিম। না!—না! যে কথা কে বলে? আমি তোমার স্বপ্নেরেরী করিব।

জুলিয়া। এত শীঘ্র?

সেলিম। জুলিয়ার বাদমা আকবর মাহের সন্তান আমি। আমার ইচ্ছা—জুলিয়াকে হোতাগপাড় করিয়া দিতে পারে।

জুলিয়া। তা কি আমি না জনাব। কিন্তু—হুঃখী বাহি আমি, ভয় হয়।

সেলিম। কিসের ভয়।

জুলিয়া। আপনার পরিবর্তিত পত্নী পাটিলানী।

সেলিম। তাহার অপাল জাগিয়াছে—

জুলিয়া। আর খেহের-উন্-মিসা—

সেলিম। সে আমার স্ত্রীস্বরূপ। হত্ন কি সত্য হয় না জুলিয়া ?
সবার হয় আমার হইবে না কেন।

জুলিয়া। আপনার অঙ্ক স্বপ্ন সবই সত্য হইতে পারে—কিন্তু এটা
হস্তরা বড় শক্ত !

সেলিম। কেন—

জুলিয়া। তা—জানি না !

সেলিম। আর সত্য হয় না। তোমার রূপ যেন রাজকন্যার মত !
জুলিয়া। জুলিয়া। তুমি কখনই বাদী নও।

জুলিয়া। বহি সাহাজ্যাবান তাই আদেশ হয়, আমিও সর্বদা
বলিতে পারি আমি আপন ছাড়া আর কারও বাদী নই।

সেলিম। জুলিয়া !

জুলিয়া। কেন বলাব ?

সেলিম। এ হিন্দুস্থান আমি বলে কাল আমার হইবে ! আমার
হৃদয়ে—এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য—রসাতলে বাইতেও পারে
কিন্তু—

জুলিয়া। সব জানি। সব বুঝি। কিন্তু আপনি কি আদেশ
করিতেছেন ?

সেলিম। তুমি আমার কাছে এস। এই স্বর্ণচিহ্নিত আসন
অধিকৃত করিয়া আমার কর্তৃত্ব কর। আমার প্রাণের জালা নিভাইয়া
দাও।

জুলিয়া। হি ! হি ! শু কথ্য বলিতে আছে হজুরাণি ! মেহের
কি মনে করিবে !

সেলিম। মেহের ! মেহের ! মনে করিবে ! করে করুক। তুমি
আমার কাছে এস। এখানে মণিকার প্রবেশ নিষেধ। কেহ
জানিবে না।

জুলিয়া। মেহের চুলোর যাক—যোধ্যায়াই—কি মনে করিবে ?

সেলিম। যোধাবাই ?

জুলিয়া। হাঁ—আপনার বন্দ-পরিণীতা পরী।

সেলিম। সেও জাহান্নামে যাউক।

এই সময়ে সেট কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া, এক অনিন্দ্য-সুন্দরী, গুরুমুখো প্রবেশ করিল। সহাত মুখে বলিল—“বালাই! যোধাবাই জাহান্নামে যাইবে কেন সাহাবালা? যখন নিজের হাতে স্বর্ণ সৃষ্টি করিতে পারি, তখন জাহান্নামে কেন যাইব—খুলতান! জাননা তুমি—হিন্দু রমণীর প্রাণে কত অকৃত্রিম পতিপ্রেম! সে প্রেমে, শত সহস্র অর্গের সূচনা হইতে পারে! সত্য বৈজয়ন্তী—সে সৃজিত অর্গের অনাবিল সুখমালতীরে পলায়িত হয়।”

জুলিয়া সন্নিহয়ে দেখিল—তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রূপসৌরব-মণ্ডিত, স্বীকৃত-প্রাপ্তি ময়ী, এক সুবর্ণ প্রতিমা। সে প্রতিমার চোখ দিয়া যেন বিজ্ঞানদ্বারা স্মৃতিত হইতেছে। সে মরমে, সে আত্ম—যেন কত দুখ কত বিষাদ। কত টেক্ষা।

সেই স্বীকৃতমণ্ডিত, প্রাপ্তিময়ী, সুবর্ণ প্রতিমা, সরোবে গজিরা বলিল—
“বন্দী এখানে বসিয়া কি করিতেছিলি।”

সাঁদী জুলিয়া কুণীশ করিয়া বলিল—“মা! হীনবংশে আমার জন্ম নয়। জাগ্রদোষে বন্দী হইতে হইয়াছে—কি করিতেছিলাম, সবই ত দেখিয়াছ—বা শুনিয়াছ মা।”

যোধাবাই প্রসন্ন মুখে বলিলেন—“হাঁ—সব দেখিয়াছি, সব শুনিয়াছি। অকৃত্রিম কিছু দেখিলে আমি তোকে কোজল করিবার ব্যবস্থা করিতাম। কিন্তু সাবধান করিয়াঃ বুঝিয়া চলিস্!”

“কেন মা”

“তোমার রূপের জ্যোতি অতি প্রাচুর্য।”

“আপনার হাতে তর কি?”

“পুরুষের মন—কানের মত । কখন কি হয়।”

“তা সত্য—কিন্তু কার সাধ্য—যে মন তোমারে, যে কলয়ে
তোমার স্বমিকার, কার সাধ্য তাহাতে পক্ষিলা ছায়া প্রতিফলিত করে ”

“তাও—ত অসম্ভব মন জুলিয়া ।”

“কিসে জানিলে না ?

“ভয় কি কিছুই বুঝিল না ।”

“বুঝি—বালি তাই নয়—

“কি !

“দেখিতেছি ! সর্বনাশী মেহেরউল্লাহ! আদিয়া তোমার মত সত্য
সাধার স্তম্ভিত ছবি, সাহজাদার মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা
করিতেছে।”

“পারিবে কি !”

“রমণীতে না পারে কি ! রমণী হইয়াও কি তাহা বুঝ না মা ?”

“কিন্তু আমি পারিলাম কই ।”

জুলিয়া এ কথা শুনি উত্তর না দিয়া—দীর্ঘে দীর্ঘে সে কক্ষ জাগ
করিয়া ।

সেলিম—এতক্ষণ নিরাক্ষর অবস্থায়, এই সমস্ত কথাবার্তা শুনিতে-
ছিলেন । তিনি আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন—“যোধাবাই !
আমার মাজনা কর ! আমার মতিভ্রম থইয়াছে ।”

যোধাবাই—নেই পূর্বপরিচিত আসনে, সাহজাদার পার্শ্বে বসিয়া,
আমীর কঠলয় হইয়া বলিলেন—“হোক । তাহাতে আমি ভয় করি
না । আমার আর কে আছে—বামিন ! আমি সোণার সিংহাসনে
বসিয়াও, যে তোমার অনাদরে দিনে দিনে ভিখারিকী হইতেছি !
তোমার উপেক্ষায়, আমার এ রানীশিরি যে বাদিগিরিতে দাঁড়াইতেছে
ক্রিয়তম ! সাহজাদা ! সাহজাদা ! সাহজাদা ! চল আমরা দুজনে

এ পাপ রাজপুত্রী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। তোমার হৃদয়ের অস্থ
আমি নিঃসনে পাঠিলে—এই কলুষিত হৃদয়েও আমি স্বর্গ প্রতিষ্ঠা
করিব।”

“কোথায় যাইব যোনা! ও পৃথিবীতে, চারিদিকেই তে আনা!
মাতৃব রাজ্যেই যে মাতৃমের শত্রু!”

“হোক! ভাষাতে তোমার আমার ভর কি! সেখানে থাকিবে
কেবল—আমি আর তুমি। তোমার ঐ মক্কেল হৃদয়ে, প্রেম প্রেরণ
ছুটাইয়া, প্রকৃত ভাণবাসা জাগাইব, আমি এক জ্যোতির্ধর নূতন
বেগেদের সৃষ্টি করিব। আমার হৃদয়ের প্রত্যেক রক্তকণিকার সহিত
যে—প্রেম শুভাপ্রোত ভাবে নিঃসৃত, তাহার মোহনীয় শক্তিতে,
আমি তোমার চিরদিন অধীর করিয়া রাখিব। তখন তুমি দেখিবে,
পরাব পবিত্র প্রেম—সকীর মোহাৎ, পতিব্রতার যন্ত্রে, পাবাণের বুক
ফাটিয়া জল বাহির হয় কিনা। তখন তুমি দেখিবে এই অশান্তির
মংসারে, কত শক্তি—কত প্রেম, কত ভালবাসা—কত অমানবিক
সংগঠনবাদ পবিত্র সোহাগ।

“পারিবে কি?”

“পারিবে—”

“চল—তুমি যেখানে যাইবে তোমার সঙ্গে যাইব।”

“এল—”

সেলিম আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বিশাল বেহ
মেগাজীর প্রবল শক্তিতে, বাস্তবিকম্পিত শর-পত্রের জাগ মূহ
মক্কাণিত। সেলিম আবেগকরে যোবাযাইয়ের কর্ণালিঙ্গন করিয়া
বলিলেন “কোথায় যাইব আশেখরী!”

“আমার কক্ষে। কিন্তু বাইবার পূর্বে তোমাকে একটী প্রতিজ্ঞা
করিতে হইবে।”

“কি প্রতিজ্ঞা বোধা!”

“মেথেরের চিন্তা আর কখনও মনে আনিতে পারিবে না—”

সেলিম চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন—“বোধা! বোধা! ভাবিয়াছিলুম, তুমি স্বাৰ্থকলকবিনীনা দেবী মুক্তি! না—না—তা নয়! তুমি লিলাচী! আমি সব ছাড়িতে পারি। এ রাজ্যের আশা রাজসিংহাসন, সব ছাড়িতে পারি, কিন্তু আমার চিত্তের স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে পারি না, আমার স্বৰ্গ স্বর্গের চিন্তা ছাড়িতে পারি না।”

মিস্টল প্রাণহীন স্তম্ভ প্রস্তর প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া, বোধাবাই এই মিনারূপ কথাগুলি শুনিয়া। সে বুঝিল—অবুকের বিধান কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না! কর্তব্যের যখন বিপক্ষে রাজ্যকে চালিত করে, তখন তাহার মঙ্গল বুঝিই নোপ হয়। সে বুঝিল—মেথের, রাজরপে, স্বপ্নের ইরাপ হইতে আনিয়া তাহার স্বৰ্গহারা জন্মের মত গ্রাস করিতে বসিয়াছে।

সেলিমও—চিন্তাময়। তিনি আজ পাণের উত্তেজনা বশে—তাহার দূর্গপরিণীতা পত্নীর সমুখে একটা মহা পাণের কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। যে তাঁহার চিত্তসুখের জন্ত রাজ্যীয়ে ছাড়িতে প্রস্তুত, সারীজীবনের সকল সুখই ত্যাগ করিতে উচ্চত, যে চিরলাহিতা উপেক্ষিতা, অপ-মানিতা হইয়াও ক্ষোদ শূন্য—তাহার সুখের উল্লস এ কথাটি বলা কি ঠিক হইল! কাজটা কি ভাল হইল! অভিমানিনী, আত্মসম্ম-দৌর্যবিনী, পতিপ্রেমাপুরজ্ঞা রাজপুত্রবালা—একথা শুনিয়া বড়ই মর্ষবাধা পাইয়াছে।

বোধাবাইএর চুটি উদ্বুদ্ধ বাতায়ন পথে সংজ্ঞ। তিনি দেখিলেন সেই গভীর দিশীখে নীলাকাশে, উজ্জল তারাদ্বারিষ জ্যোতিক ফলিত করিয়া, নিশান্যায় সময় প্রকৃতিকে রজত-স্রোত-প্রাবিত করিতেছেন। রক্তপ্রস্তরদয় দুর্গ মিনারের অতি উচ্চ স্থানে, চঞ্জ কিরণ পড়িয়া

তাহাকে উজ্জ্বলিত করিয়াছে। কলনাদিনী শুনিল মলিনপ্রবাহপূর্ণা, তরল-তর-রক্ত-বধূরা, যখনার বৃকে সেই নিঃসঙ্গ চন্দ্র-কিরণ পড়িয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। ঘোষাবাই বুঝিলেন—ভগবানের বাজ্যে, এই স্বাস্থ্য, প্রোজ্ঞান চন্দ্রকর স্বেচছিত নিশীথে, সকলেই স্থাপিত—কেবল দুইজন মাত্র মলিনচিত্ত রাজপ্রাণাদের মধ্যে সেছাপুঞ্জিত নরকের অজবাবে জুড়িয়া আঁধার বাতনার অধীর হইতেছে।

সেলিম—এক রক্তখচিত মণ্ডলস্তম্ভের উপর হেলান দিয়া মহা অপ-রাধীর মত কি ভাবিতেছেন।

ঘোষাবাই সহসা মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—“সাহাভা! আমার একটী প্রার্থনা আছে।”

সেলিমেরও চমক ভাঙ্গিল। তিনি সেই স্বর্ধখচিত স্তম্ভাংশের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া—কম্পিতস্বরে বলিলেন—“কি প্রার্থনা ঘোষাবাই?”

“আমি একটা অল্পমতি চাহিতে আসিয়াছিলাম।”

“কিসের অল্পমতি?”

“আমি কাল এভাবেই অন্ধরে ছাইব।”

“অন্ধরে যাইবে! মানসিংহের আগারে! কেন?”

“এক সপ্তরে দুইজনের স্থান হইতে পারে না, এক প্রাসাদে দুইজন অধীশ্বরী থাকিতে পারে না।”

“বাদশার প্রথমলে ত তার অভাব নাই।”

“না থাকিতে পারে। কিন্তু তারিয়া বেগ—বহল প্রেমপাত্রী থাকিলেও অধীশ্বরী একজন।”

“আমার নিকট এরকম অল্পমতি চাহিতেছ কেন? আকবর-সাক অধিরণী পূরবধু আমি! উপর কাছে যাক। পিতা বর্তমানে—আমার কোন স্বাভাব্য নাই। আমি এ দীন দুনিয়ার মালিক—বাহার হুজুে শাহবের নাপা যাক, মাঝা থাকে, তাহার কাছে যাক।”

“কিন্তু আমি পত্নী! স্বামীর অন্তিমতি না হইলে, আমি আপরা
ছাড়িতে পারিব না।”

সেলিম উদ্দেশপূর্ণ চিত্রে, বেহনর মুখে, প্রেমবর্ণিত্বের দলিলেন,
“না—না, যোদ্ধা! আমি তোমার অন্তিমতি দিব না। তুমি আমার
উজ্জ্বল বৈধবস্ত। নরকের আগ্নার বধন এ গ্রীণ পুড়িয়া হারবার
হয়, তখন তোমার কাছে শান্তির আশায়, ছুটিয়া বাই। যখন এ নির্দুঃ
খগতে সকলের নিকট অনাবৃত উপেক্ষিত হই—তখন তুমি আমার
আশ্রয় কর। যখন দারুণ মর্গ যান্ত্রিক, এ বিশ্ব আমার চক্ষে তলাইয়া
যায়, তখন তুমি প্রাণের সহজে এক নুতন বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া আমার
আশ্রয় দাও—কোথায় বাইবে প্রাণেরখরী! এ হতভাগ্য সেলিমকে,
প্রচণ্ড হত্যাশনের মুখে—কেলিয়া কোথায় বাইবে নির্ভুবে?”

যোদ্ধাবাই ক্রোধ ভুললেন। তাঁহার বিবাদ গভীর অভিমান-
মগ্নিত মুখে আবার হাসির রেখা ছুটিয়া উঠিল। তিনি সেলিমের পর-
প্রান্তে বসিয়া, তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত চুষন করিয়া, দুঃখপ্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে
বলিলেন—“তুমি যখন নিষেধ করিতেছ—তখন বাইব না। কিন্তু যদি
এখানে থাকিতে হয় ত রাজদাজেখরীর মত থাকিব। সেহেরকে
আর এ পুরীতে প্রবেশ করিতে দিব না। তোমাকে আমার স্বপ্নের
সঙ্গে লুকাইয়া রাখিব। না—কহি, আমি রাজপুত্র কহা নই—আকবর
শাহের পুত্রবধু নই, সুলতান সেলিমের পত্নী নই।”

আর কিছু না বলিয়া যোদ্ধাবাই, বিদ্রাববেগে দুঃখুর্ভবণে সে স্থান
ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সেলিম বহুদুঃখ এই সব কথা শুনিতেছিলেন। তিনি প্রেমপূর্ণ
কণ্ঠে ডাকিলেন—“যোদ্ধা! যোদ্ধা—কিরিয়া এস।”

সুলতানের প্রেমপূর্ণর সেই মর্গর পচিত কণ্ঠে, কেবল একটা ক্ষীণ
প্রতিধ্বনি ভুলিল। যোদ্ধা আর কিরিল না। (ক্রমশঃ)

295

বাগী-বন্দনা । *

(শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)

ঐশ্বর্য চরণে না বাগাশানি ! অন্নবরণা সরোজবানিনী,
রূপার তার' গো দুস্তরমাগরে বেদনিত্য-প্রসবিনী,
মূর্ত্যজনহৃৎখনাশিনী না জ্ঞানবুদ্ধিসারিনী ॥
রক্ত-জ্যোত্স্না-আলোক জিনি,
সিতবরণে দ্বিক-প্রসোদিনী,
দুস্তপক্কে হৃদয় শোভিনী, কটাক্ষে ঈশ্বর করণো জননী ॥
অধর বজ্ররে বাণা বাজে,
চরণপঙ্কজে স্নেহ গাজে,
জুবনমোহিনী উজ্জল সাজে,
বিরাগে রাগ-রাগিণী-রাণী ;
দীনজন কাতর বচনে,
নিবেদি গো দেবী তোমার চরণে,
অজান-আঁধারে পূর্ণিত অঙ্করে, দেবি আলোক প্রসন্ননয়নী ॥

স্বপনে ।

(শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত)

মিশিবে আঁজি দেখিছ স্বপনে
দেবীর মুরতি কমলআসীনা,
আসে পাশে চারিদারে তার
উঁকি মারে উষা গোপালি বরণা ।
চরণগরোজ চুমিয়া চুমিয়া
আকুল লবীর বহিরা বায় ;
দরাল মরালী ঐবাটা তুলিয়া
তুলিয়া তুলিয়া আসিছে হার ।
সুগন্ধ সরসী রবেছে চাহিয়া
প্রবাহ রুধিরা ভিমিত নমনে,
সুখ পানে তাঁর চাহিয়া চাহিয়া
ফুটিছে নলিনী প্রভাত জীবনে ।
বেলিছে বীণাটি জোড়িতে তাঁহার
সঙ্গস্থর তায় বীরবে যুঝায়,
হেরিছেন দেবী চাহিয়া চাহিয়া
সম্মুখে সন্তান পূজিছে তাঁহার ।
ক্রোধী-রূপে বিকল কাতর মুনি
যোগেতে মগন। সম্মুখে বসিয়া,
পূজিছেন মার চরণ দুখানি
খ্যাস কাদিদান পিছনে বসিয়া,

ভারত বঙ্কিম, প্রসাদ ঈশান
 নবীন যদু হেম কুন্তিবাস,
 বিহঙ্গ দিহাবী বিহঙ্গ নয়নে
 বুজিছে কোথায় লায়লা আশান।
 অকস্মাৎ জ্বলি পশিল শ্রবণে
 কহিছে সকলে গম্ভীর বদনে,
 চলিছেন না তুলোক দর্শনে
 যাদের লগ্ন তাঁরে সকল সজ্জানে।
 অকস্মাৎ মোর জাগ্রিত স্বপন
 আকুল নয়নে রহিল ঢাঙ্কিয়া
 উকি মাঝে উবা গগন ভেদিয়া,
 নাচে তরু লতা হাসিয়া হাসিয়া।
 বলয় আরভে শীত অবসানে,
 সেজেছে প্রকৃতি নবীন বরণে,
 জমনী তাই আগিছেন বেণার
 চালিতে অশীষ আজিকে ভুবনে,
 কে আছে কোথায় ছুটে গবে আর
 পূজিতে আজিকে মায়ের চরণে।

আবাহন ।

(ত্রীকিরণচন্দ্র দত্ত লিখিত)

১

দীর্ঘকাল পরে এসেছে আবার
জদি কুণ্ডবনে অমর-বালা !
খুঁচিয়া গিয়াছে মনের আঁধার,
পর্যাণে প্রেমের তরঙ্গ খেলা ।

২

কাহার শ্রীকর-কমল পরশে
বাজিয়া উঠিল হৃদয়-বীণা ?
আঁতট তরঙ্গ মালস-পরশে
কেবা সে অরালী তুলিল নামা ?

৩

ফার কলকণ্ঠ পশিয়া শ্রবণে,
মরমে মরমে মারিল তান !
আকুল করিয়া অত্যাগা পর্যাণে,
লাইল অমরাবতীর গাম ।

৪

বহু বর্ষব্যাপী হিমালীর পর
সরস বসন্ত কেন রে এল ?
শত অমানিশা বোর অন্ধকার
দামিনী চমকে দিমায়ে গেল !

৫
কে তুমি রূপসী পরাণ-বঞ্জিনী,
আনন্দ-নারিনী মহিমাধরী,
রূপে-অপে যোর মানস-মোহিনী,
সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই ?

৬
কে পো তুমি বালা উদয় করয়ে,
শান্তি-সুখা তাল পরাণে মোর,
আনন্দের স্রোত জ্বরে ঢালিয়ে,
নৃতন প্রেমোন্মেতে করণো তোর ।

৭
এ জনি বিপিনে নিভৃত নিবুজে
বসে না কোকিল, গায় না গাথা ।
নাহি ফুটে ফুল, অলি নাহি গুঞ্জ
হেরি বুক জোড়া বিবাদ ব্যথা ।

৮
পালিয়ার গান, ঘরেলের ভান
উঠে লাই কতু হারয় বনে,
তবু দীর্ঘকাল ভরা এ পরাণ,
তবু বা হতাশ এ (পোড়া) মনে ।

৯
কি তুমি দেখি, অরুণীমণিনী,
অপে-অপে আসি উদয় হও ।
তবু তুমি রাণী, জয়গাথিনী,
হামিনীর সম মানসে রও ।

১০

তাই কখন কখন, এ ভর বিপিনে
নন্দনের শোভা দুটো উঠে ।

১১ তাই হুটে ফুল বীর সমীপে,
অর্ঘ-পুষ্প-গচ্ছ উখলি ছুটে ।

১১

তাই যো তখন আসে শিকর
জদি সহকারে পাইতে পান !

দয়েল, পাপিয়া ঢালি অধুসর,
মাতাইরা তোলে অভাগা প্রাণ ।

১২

তাই করি লাগে হে সুর-সুন্দরী
আজীবন তোমা' মাঝে সেবি !

দাসে রূপা করি এস সুরেশ্বরী !
দীন বীনে ঢাল করুণাধেবি ।



শুশানখাটে গিরিশচন্দ্র ।

ভীষণ শোক-সংবাদ ।

আমরা পতীর শোক-সংস্কারে অকাশ করিতেছি,—
বাংলায় সর্বনাশ হইয়াছে ; বাংলা সাহিত্যের সাধনক্ষেত্রে—
সর্বস্বতীর পবিত্র মাটিতে অতিভার দুইটি দিবা দীপ নির্ধাপিত
হইয়াছে । শোকাঙ্ককারে আজ বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্র সমাধির ।

সত ২১শে মাঘ ববিবার বেলা প্রায় সাড়ে এগারটায় সময়
বঙ্গের বর্জীয় লেখক, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার মনোমোহন বসু
স্বদেশীয় চুরাশী বৎসর বয়সে অনন্তভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ।

জন্মস্থানের উপর আবার জন্মগা—মনোমোহনের বিরোধ-
ব্যথা লাগব হইতে না হইতে বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যচর্চা, বর্জীয়
নাট্যশালায় প্রতিষ্ঠাতা, সর্বজনবিদিত নাট্যমণ্ডলী পরিচালক বোম
মহাশয় গত ২৫শে মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১টা ৫৩ মিনিটের
সময় ৬৮ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন ।

শোকব্যরণ ভগবান বর্জীয় মনোমোহন ও পরিচালকের
শোকান্ত পরিবারে শান্তি ও সাধনা দান করুন, ইহা আমরা
কামনা ।

জানান্তরে এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইল । পরিচাল-
কের লিখিত “নাট্য-কলা” এবং নাট্যমন্দিরের পঠিকণ
উপভোগ করিয়াছেন । উক্ত প্রবন্ধ ছাপা হইবার পর নাট্য-
চর্চা লোকান্তরিত হন । “বর্জীয় নাট্যশালায় ইতিহাস”
এবং উত্তম ছাপা হয়—তখনও তিনি জীবিত ; সেইজন্যই
উক্ত প্রবন্ধে তাঁহার অতিথের আভাষ বৃচিত হইয়াছে—এই
কারণেই আমরা মাঘ মাসের সাধা স্বতন্ত্র প্রকাশিত না করিয়া
পরিচালক ও মনোমোহনের বিরোধবর্তীকরণ—একত্র প্রকাশিত
করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি ।

গিরিশচন্দ্র ।

(শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ।)

বাঙ্গালীর হুৰ্ভাগ্য,—বঙ্গভূমির বরপুত্র, ভগবান রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় ভক্ত, বঙ্গ সাহিত্যের একনিষ্ঠ লাবক, বঙ্গীয় নাট্যশালায় অন্মদাতা, নাট্যসাহিত্যের চক্রবর্তী সন্মিতি, নাট্যাচার্য্য, মটকুলকেশরী, বঙ্গবিস্কৃত-কীৰ্ত্তি গিরিশচন্দ্র নব্বয় নরলোক ত্যাগ করিয়া বিবাহবিধির পাণক হইয়াছেন,—সর্বজয়ী সাহিত্য-রত্নী সাহিত্যের নাথনকোরে জীবনের ত্রুত উদ্ধাপন করিয়া পাথনোচিত ধামে যাত্রা করিয়াছেন ।

বঙ্গ-সাহিত্য-গগনের সর্বোচ্চ জ্যোতিষ্ক আজ অন্তমিত ! বাঙ্গালার গৌরব—বাঙ্গালীর গৌরব—বাণী ও রম্য বরপুত্র সর্বজনপ্রিয় মহাপুরুষের পূতপাবিত্র জীবন-প্রবীণ আজ মহাকাশের একটি ফুৎকারে নির্দাপিত !—সেই সৌম্য মৃদু, চিরসুন্দর, প্রতিভার অবতার নাট্যজ্ঞক ভৌতিক দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া এতদিনের পর মরণ-সঙ্ঘের অতীত হইয়াছেন,—হায় ! নিরুপায় অসহায় দুর্বল মানবকে গুরুর প্রতিমাত্মক অনন্ত কালসাগরে বিসর্জন দিতে হয় !—নিয়তির এমনই কঠোর নির্জঙ্ক !

বাঙ্গালার আজ শোকভরপুর অবধি নাই ! সহস্র বঙ্গভূমি আজি শোকতাপের হাধাকারে পরিপূর্ণ ! বঙ্গের বঙ্গভূমি বিবাহের বনাদ্যকারে সমাচ্ছন্ন ! হায়,—এতদিনে হুৰ্ভাগ্যদেশে নাট্যজগতে পুরাতনের সাক্ষী প্রায় বৃদ্ধ হইল,—অতীতের লিখিত বর্তমানের বন্ধন-গ্রহি-প্রাণ ছিন্ন হইয়া গেল, বাঙ্গালীর গৌরব-এবি অন্তমিত হইল ! হায় মা বঙ্গভূমি তোমার

“একে একে

শুকাইছে ফুল এবে নিবিছে দেউলি

শীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী !”

তোষার হুজুগের অবধি নাই। তোষার বকের উজ্জল
মিদি, তোষার গৌরব ও ধর্মের সার সামগ্রী অক্ষত হইল।
বকের হুমকুড়ু: অশ্রুভঙ্গে মিশিয়া গেল। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য
শোচনীয়।

“অনন্তরানি কৃতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।”—কে কাহার মৃত শোক
করে? কালের অনন্ত প্রবাহে একো ক্রমিক যুগের কোটী কোটী জীব
ব্রহ্মদের জায় উন্নত ও নিম্ন হইতেছে,—কে তাহা গণনা করে?
কিন্তু এই কাল-প্রবাহে কল্যাণ এমন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়,
বীহাদের তিরোভাবে বর্তমানের স্থানে হাহাকারধ্বনি তপিত হয়,—
সমগ্র দেশ বীহাদের চরণে অক্লান্ত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে। গিরিশচন্দ্র
এই প্রেমীর ক্ষণকাল্য মহাপুরুষ, ভাগ্যবান কর্মবীর। তাই আজ
সমগ্র দেশে—ভারতের বিশাল ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের বিয়োগে বিলাপ ও
হাহাকার প্রাকটনিত হইতেছে। তাই আজ দেশের আশাস্বরূপমিতা
বকের প্রান্তরে, অরণ্যে, পর্বতে, নগরে, গ্রামে, অশ্রুভঙ্গে, সর্বত্র কলনার
মেয়ে গিরিশের ছবি দেখিতে পাইতেছে। তাই আজ গিরিশের
জগদুদ্ভট লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী স্বরূপে জ্বরে গিরিশচন্দ্রের সত্তা অক্ষুণ্ণ
করিতেছে।

জীবনপ্রান্তে জীব ভাসিয়া যায়।—“চিরস্থির কবে নীর হার রে
জীবন-নদে?”—অগুণ্ণ মহাপুরুষের জীবন-নদের নীচে চিরস্থির নহে;
তিনিও সেই অনন্তপথের পথিক। মর-জগতের কোনও বস্তু অনন্তের
ফাঁদে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, তাইনিমের পাছখাল পড়িয়া থাকে,—
মানব অনন্তের প্রবাহে ভাসিয়া যায়। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র সেই
পথ,—অমরতার সেই কবিকুঞ্জ পথে—যেখানে উষর, বহিস, হেম,
নবীন, রমেশ, দীনবন্ধু, যোগেন্দ্র, ননোমোহন, লাগেছে তাহার প্রতীক্ষা
কবিতেছেন,—সেইখানে সম্মানে সম্মিলিত হইয়াছেন।

চরিত্র-চিত্রে।

গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীর গৌরব, বাঙ্গালা দেশের সমুদ্রতল হস্তকৃষ্ণ। গিরিশচন্দ্রের জীবন প্রতিভার ধান। তিনি বাংলা সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক। নানা পথে, নানা ভাবে, নানা উপায়ে, নানা উপকরণে গিরিশচন্দ্র সাহিত্যের পূজা করিয়াছেন। তিনি সাহিত্য-জগতের চরণে যে অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তাহা অপূর্ণ, অমূল্য, অতুলনীয়। গিরিশচন্দ্রের প্রদত্ত এই অর্থরাশি—অমূল্য নাট্যরসাবলী—সার ভাষ্যের অগুণী সম্পদ; ভাষ্যবান স্ক্রুতিশাস্ত্রী পুস্তকপ্রদত্ত এই অপূর্ণ দত্তরাশি ভাষ্যরসাত করিয়া জননী বঙ্গভাষা আজ গৌরবান্বিতা;—এমন কৃতিমান পুস্তকের বিরোধে তাই আজ তিনি শৌকে চুপে নুহমান।

গিরিশ-স্ট্র সাহিত্যের মূল উৎস,—গিরিশের প্রতিভা। প্রতিভার বলেই তিনি সর্কবিজ্ঞানবিদ্যার, নাট্যকলাকূশল, নাট্যাচার্য্য, নাট্য-জগতের চক্রবর্তী সম্রাট, সাহিত্যের উজ্জল কোহিনূর, সর্কবিদ্যায় সর্কবিজ্ঞানবিদ্যার সুপণ্ডিত। গিরিশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন নাই; তজ্জাত তিনি সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই অনেক উপাধিধারী বিভাদিগুণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। উপাধিশূন্য হইয়াও কঠোর সাধনা ও প্রতিভার প্রভাবে মাহুৎ যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে,—গিরিশচন্দ্র লোকচক্ষুর সমক্ষে তাহার উজ্জল আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র গুণ্যবলে যে প্রতিভার অধিকারী হইয়াছিলেন, সংসারে তাহার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, বঙ্গ-সমাজে তাহার আদর্শের প্রভাব অল্প নহে।

গিরিশচন্দ্র জানে গরিষ্ঠ ও বিজ্ঞান প্রধান হইয়াছিলেন। অতীত

স্বল্পপ্রাপ্ত গ্রন্থাদি অধ্যয়নে তাঁহার কৃতি মার্জিত ও সংগৃহীত হইয়াছিল । সেই সুকুমার কৃতির পরিচয় যে পাইরাছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে । গিরিশচন্দ্র সৌন্দর্য্য-বৃষ্টির অধিকারী ছিলেন । চিত্রে, সাহিত্যে, ভৌতাত্ত্বিক ত্রিভুজ সৌন্দর্য্য ও সুরচিত্র সাধনা করিয়াছিলেন । সুপণ্ডিত, সুবদিক, মিষ্টভাষী, সহচর, অনায়াসিক, মিষ্টাচারী, সুকবি, সুশেষক, নাট্যকার, ঐগত্যাদিক, নাট্যাচার্য্য, নটরাজ, মেহনত, গুণগাহী, গর্ভাঙ্গরাণী, বহুবংশল—কোন বিশেষণ গিরিশচন্দ্রের পক্ষে সঙ্গত নহে ? সাহিত্যিক-সমাজে তিনি সৌন্দর্য্যের ও বিনয়ের অধিকারী ছিলেন ।—সমদর্শী, বহুবংশল, আত্মীয়বন্ধন ও বহুবান্ধবের হিতাকাঙ্ক্ষী জনপ্রিয় গিরিশচন্দ্র মধুর চরিত্রে মধুর বাণহারা সকলের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন । ইহা অস্বাভাবিক নহে, অসম্ভব নহে ;—সত্য ।

গিরিশচন্দ্রের রামকৃষ্ণজ্ঞান ও মহাজনগণের প্রতি আস্থা সীমা ছিল না । আশ্রিতবৎসল্য, আত্মীয়বান্ধবে আশ্রিত, ভক্তজনে অত্যাগ তাঁহার চরিত্রের বর্ম্ম ছিল । সৌভাগ্যক্রমে লেখক তাঁহার আশ্রিত ও মেহের অধিকারী হইয়াছিল । সে মেহের বিস্তারিত শুদ্ধ হইল, কিন্তু তাঁহার পবিত্র বহুত্ম স্বত্বিত কলকাত্তরয়ে চিরকাল স্থায় করিব । যে একবার গিরিশচন্দ্রের পরিচয় ঘেছে যত্ন হইয়াছে, সে কখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে কি ?

বাংলায় গত চল্লিশ বৎসরের ইতিহাসের পৃষ্ঠাঙ্গ, নন্দভাবের অরুণ-কাহিনীর গ্রন্থ অধ্যায়ে গিরিশচন্দ্রের অরণীর মন্দির জীবন চিত্রিত হইয়া আছে,—ভবিষ্যতে বাবুজ্ঞানবিবাকর স্বর্ণাঙ্করে তাহা দেবীপ্যমান থাকিবে । সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ অসম্ভব । রামকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত, নবীনচন্দ্র ও মীনবন্ধুর বহু, ঈশ্বরভক্তের শ্রিয় শিখা গিরিশচন্দ্র সে কালের স্বত্বভক্তের জ্ঞান বাণালয় বিদ্যাক করিতেছিলেন । কাল-সমুদ্রের তরঙ্গে তাহা ভাসিয়া গেল ।

বঙ্গের নাট্যশালা আজ গিরিশচন্দ্রের বিরোধে তবোময়। পকাশ
বঙ্গবন্ধুর কথা,—বঙ্গের এই শিশু নাট্যশালায় সচন্দ্র উজ্জ্বলতার তান
ছিল, উজ্জ্বল ছিল না; চেষ্টার আকাঙ্ক্ষা ছিল, চেষ্টা ছিল না;
কামনা পূজ্যকৃত হইরাছিল, কিন্তু উপাধান উপকরণ ছিল না।—এই
নাট্যশালায় যখন স্তম্ভপাত হয়,—তখন কৈ জ্ঞানিত, নাট্যকলা কখনো
একমিষ্ট সাধক পুঞ্জ গিরিশচন্দ্রের আশ্রমে একদিন এই নাট্যশালা
বঙ্গদেশে যুগান্তর উপস্থিত করিবে? কে ভাবিয়াছিল, নাট্য-লগ্নের
ঐশ্বর্যশ্বেত্রে—যে বীজ অক্লুপিত হইয়াছে, গিরিশচন্দ্রের জীবন-লগ্ন
চেষ্টার, অক্লান্ত পরিশ্রমে, হৃদয়ের শোণিত সেচনে একদিন তাহা মহা-
ক্রমে পরিণত হইবে? বাহ্য স্বপ্ন ছিল, আজ তাহা কঠোর সত্যে
পরিণত হইয়াছে। বাহ্য কামনার কল্পলোকে আকাংক্ষাত্বের জ্বর
কটিকাছিল, তাহা প্রকৃত অমৃত্যুতানে পরিণত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রই
বঙ্গীয় নাট্যশালায় জাগ্রত পুণ্যবান জ্ঞাতি। পূর্বপুরুষের সত্যলগ্নে,
পূর্বজন্মের স্মৃতিবলে, বাঙ্গালীর সৌভাগ্যবশে, প্রতিভার পুণ্যপ্রভাবে
গিরিশচন্দ্র নাট্যলগ্নতে বঙ্গীয় নাট্যশালায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়া-
ছেন। সে স্মৃতি কি ভুলিবার? বঙ্গীয় নাট্যশালায় সহিত গিরিশ-
চন্দ্রের সম্বন্ধ চিরদেহীপাশান। স্বর্ণে ও মর্ত্যে জীবনের সম্বন্ধ আছে।
সে সম্বন্ধ কি কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে?

না,—সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার নহে; সে সম্বন্ধ ভুলিবার নহে।
স্বর্ণে মর্ত্যে সম্বন্ধ আছে। নাট্যলগ্নের শৌভিক দোহের তিরোভাব
হইয়াছে,—কিন্তু তাহার প্রতিভার প্রভাব সমগ্র বঙ্গে, সমগ্র ভারতে
বৈদ্যাতী-শক্তি বিকীর্ণ করিবে। নবরাজ্যে সগ বাহু, কিন্তু স্মৃতি
বাক্যে; কীর্তি বাক্যে।—“কীর্তিবন্ত স জীবতি”।—গিরিশচন্দ্র মর্ত্যের
মায়ী-মুখল তির করিয়াছেন;—আজ তিনি লোকচন্দ্রের অতীত;
কিন্তু বাঙ্গালীর দ্বন্দে তাহার স্মৃতি, বাঙ্গালী দেশে তাহার কীর্তি অমর

হইয়া রহিলে। তাঁহার সমুচ্ছল আদর্শ বাংলাভাষ্যে চিরবেদীপ্যমান থাকিবে। বাংলার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সেই উন্নত আদর্শের প্রভাবে অল্পপ্রাপিত ও উৎকৃষ্ট হইবে। গিরিশচন্দ্রের মর-সৌন্দর্য-সীপ কালের কলঙ্কারে নিষ্কাপিত হইবার নহে। তাঁহার অবিনশ্বর স্মৃতি, তাঁহার অপূর্ণ প্রতিভার হেদীপ্যমান কীৰ্ত্তি, তাঁহার অমূল্য নাট্যগ্রন্থাবলী, তাঁহার সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ ও কবিতা, তাঁহার সর্বরসসম্বিশিষ্ট কীৰ্ত্তিসমূহ বাংলাভাষ্যে চিরদিন আশ্রয়দায়ক থাকিবে,—বাংলার নাট্যশিল্প, বাংলাভাষার আবাস-ভবনে গিরিশচন্দ্রের কাব্যপ্রদীপ চিরদিন পবিত্র নিদ্রাশ্রয় বিস্তরণ করিবে।

গিরিশচন্দ্রের কবি-প্রতিভার উদ্বেগ—কবিভূক্ত নগ্নীতে, বিকাশ—অভিনয়ে ও নাটক রচনায়। তাঁহার প্রথম রচনা—প্রায়শ্চরণের কল্পনাপ্রসঙ্গ “রাবণ বধ”। গিরিশচন্দ্র অবিস্মার্য কবি ছিলেন। জন্মেই তিনি নাতৃত্বাচার পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝিয়া উঠিলেন। তাহার কল্প—পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও হাজিরদোস্তল মানাবিধ অমূল্য নাট্যগ্রন্থাবলী। আসলার স্তম্ভ হুংগ, বাংলাভাষার পাপ তাণ, বাংলাভাষার প্রবর্তা হারিহর লইয়া গিরিশচন্দ্র “প্রভু” ও “বলিদান” রচনা করেন। এই দুইখনি সামাজিক নাটক রচনা করিয়া গিরিশচন্দ্র বাংলাভাষার জীবন সমবেদনার সিদ্ধ করিয়াছেন,—বাংলাভাষার রুচি সান্ধিত ও প্রবৃদ্ধি উন্নত করিয়াছেন।—“আমার সানান বাগান শুকিয়ে গেলো!”—“বাগানের কল্যাণ নহ—বলিদান!”—এমন মর্শ্বভেদী বাণী আর কি কাহারও মস্তক হইতে কখনও উদ্ভূত হইবে ?

ইতিহাসের গহন কাননে প্রবেশ করিয়া গিরিশচন্দ্র বাংলাভাষার অতীত যৌবনের স্তম্ভপ আবিষ্কার করিয়াছেন,—তিমিরময় বয়ির বাংলাভাষার কর্ণে এক অপূর্ণ অবদান-অমৃত সেচন করিয়াছেন। তাঁহার “সিঙ্গাঙ্গদোলা” “সীরকাশিম” “ছত্রপতি” প্রভৃতি প্রহরাজি নাট্য-

সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। গিরিশচন্দ্র বঙ্গদেশে প্রথমে উদ্দীপিত হইয়া বঙ্গ-নাট্য উদ্যান উন্মাদনায় বাঙালীর তন্ময় করিয়াছেন। কখনও অতীত গোড়বন্ধা দীর্ঘন করিয়া বাঙালীকে অশ্রুপারায় দ্বিত্ত করিয়াছেন। শেষ জীবনে গিরিশচন্দ্র সমাজ ও ইতিহাসের পথে দীপ্তে দীপ্তে শব্দত আদ্যধর্মের গবিত্ত তপোবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহার ফল,— “শঙ্করাচার্য্য” ও “তপোবন”।—এই “তপোবন”ই তাঁহার শেষ জীবনের পূর্ণাঙ্গিত। তপোবনের প্রভাবে তপোমণ্ডিত গিরিশচন্দ্র আজ তপস্বী-বার্জিত ত্রৈলোক্যবাসের পণ্ডিত।

রোগশয্যা।

গত কয়েক বৎসর হইতে গিরিশচন্দ্র খাসকছু রোগে আক্রান্ত হইয়া ভুগিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে কখনও তিনি কাতর হইতেন, আবার কখনও বা তন্তু থাকিতেন। এবার পূজার পূজ হইতেই তাঁহার রোগ কিছু যুক্ত হইয়াছিল। পূজার পর মধ্যে আবার একটু সুস্থ হইয়াছিলেন। মাঘমাসের প্রথমার্শে গিরিশ বাবু “নাট্যমন্দিরে” প্রকাশার্থে এই প্রবন্ধের লেখকের হাতে একটি প্রবন্ধ দিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি দিবার সময় তিনি আত্মরোধ করিয়াছিলেন যে, ছাপিবার পূর্বে তাঁহাকে যেন একবার প্রবন্ধটির প্রক দেখিয়া হয়। তদনুসারে গত ২০শে মাঘ শনিবার পূজার সময় লেখক প্রবন্ধটির প্রক লইয়া তাঁহার বাটীতে গিয়াছিল। কিন্তু যেখানে গিয়া দেখা গেল, গিরিশ বাবু সেইদিন মহলা প্রবন আরে আক্রান্ত হইয়াছেন। সে অবস্থায় তিনি প্রবন্ধটির প্রক আগাগোড়া না দেখিলেও স্থান বিশেষে শুনিয়াছিলেন। হায়,—তখন যথেষ্ট ভাবি মাই যে, তাঁহার সহিত সেই দালান্ধই শেষ সাক্ষাতে পরিণত হইবে।

দৈনিক আরে কেহই বিপদের আশঙ্কা করে নাই। কিন্তু ২০শে

স্বাধীন-স্বতন্ত্রতার অপরাধে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে । চিকিৎসায় সাহা সক্ষম, তাহার ক্ষমতা নয় নাই । কিন্তু কে মহাকালকে পরাসিত করিতে পারে ? বিবিলিপি অশুভমীয়া । মাহুনের চেষ্ঠা ও মত বিফল হইল । মহাকাল বাস্তবায় শ্রেষ্ঠ রক্ত হরণ করিয়া লইল ।

বুদ্ধাশ্রম্য গিরিশচন্দ্র স্বাভাবিক বৈধা ও মহিষুৎসার পরিচয় দিয়াছিলেন । তাঁহার 'গণা দিন' যে দুর্ভাগ্য আনিয়াছে—তিনি যে জীবন-বুদ্ধাশ্রম্য নাকিহলে আনিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন,—তাঁহা তিনি বুঝিয়াছিলেন । তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলেই বুঝিয়াছিলেন, এইবার শেষ । ক্রমে ক্ষয়গতি শিথিল হইয়া আসিল । রাত্রি ১টা ৫৫ মিনিটের সময় সব শেষ হইল । ভক্ত গিরিশচন্দ্র—মহাসাদক গিরিশচন্দ্র পার্শ্বব দেহপিণ্ড পরিত্যাগ করিয়া চিরবিদ্যাম—চিরশান্তি—চিরনির্ভয়—চিরজীবনের কাম্যকল লাভ করিলেন ।

গিরিশচন্দ্রের জীবন-পথের পাথরমালা—বাগবাজারের আবাস-ভবন শোকের উজ্জ্বলে ও হাবাকারে পূর্ণ হইল । বিধাদের শোকের দ্বারায় বাগবাজার অন্ধকার হইল । বাজারের উজ্জল 'দেউলী' নিভিয়া গেল ।

যাহা গেল,—বাস্তবায় তাহার ভুলনা নাই । যাহা হারাইয়াছি, আর তাহা ফিরিয়া পাইব না । নিয়তির বিচিৎ্র কীল্য । কে তাহার অমোঘ বিধান খণ্ডন করিতে পারে ? সমগ্র বাস্তব অন্ধকার করিয়া গিরিশচন্দ্র নিঃশব্দ বিধানে যে কোকে গ্রহান করিয়াছেন, সে কোকে তিনি স্বয়ং পুণ্যের ফল ও বিমল শান্তি ভোগ করুন ।

শ্মশান-যাত্রা ।

প্রত্যুষেই এই সংবাদ কলিকাতার সর্বত্র প্রচারিত হইল । সর্বত্র এই শোচনীয় সংবাদ ঘোষিত হইল । মহরের গভমাজ লক্ষ্যগণ,

জনসাধারণ গিরিশচন্দ্রের প্রতি সন্মান প্রকাশের জন্য তাঁহার ভবনে সমবেত হইতে লাগিলেন।

গিরিশচন্দ্রের বরষপু স্মৃতি চন্দ্রনে চর্চিত ও সুগন্ধি পুষ্পে ভূষিত হইল। তাঁহার অংশস্ত ললাটি ও বক্ষস্থলে চন্দ্রনাক্ষত্রে হস্ত দেবতা ব্রাহ্মকৃষ্ণের পুত্ৰপাঁচজন নাম লিখিত হইল। সমবেত জনসাধারণ তাঁহার শেষ স্মৃতি দেখিয়া লটলেন। সুখে শান্তির বিধ জায়া। মুখ্য যেন সে মুখের সৌম্য ছবি, প্রসন্নভাব স্পর্শ করিতে পারে নাই। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র যেন ধ্যানে মগ্ন। চন্দ্রন-চর্চিত অংশস্ত ললাটে নবোদিত সূর্য্যের সুবর্ণ-প্রাঙ্গি, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অশান্ত নয়নে প্রতিভার সে চিরপরিচিত নীতি কই? আনন্দময় সন্তান মহাপুরুষ স্মৃতি-সুখে মগ্ন,—সেই স্মিতপূর্বাভিভাবী গিরিশচন্দ্রের গাঁদর সম্ভাষণ আজ চিরনীরব। মহাকাল! তোমার কি অনন্ত লীলা।

বেলা আটটার সময় গিরিশচন্দ্রের প্রাণশূন্য দেহ স্থানে—কালী-বিজ্ঞের ঘাটে নীত হইল। সমবেত জনগণ শ্মশানবাড়ীর সন্নিহিত হইলেন। রোগবৈর রোগে সহস্র-গল্পী প্রতিবন্ধিত হইল। গিরিশচন্দ্রের আত্মীয় স্বজন, অম্বুচর, সহচর, কর্মচারী ও দাস দাসীর অকস্মাৎ গিরিশচন্দ্রের বহু প্রকৃতির প্রত্যয় পরিস্ফুট হইল।

শ্মশানেও লোকারণ্য হইয়াছিল। ক্রমাগত স্থানে জননমাগম হইতে লাগিল। গাড়ী ঘোড়ার ভিড়ে শ্মশানবাট সন্নিহিত রাজপথ পথিকের অগম্য হইয়া উঠিল।

দশাভীয়ে চন্দ্রনকাঠের চিত্তায় গিরিশচন্দ্রের বরষপু ভস্মমাংস হইল। হায়! যে নিকি হইতে এক একটি অমূল্য গোহীনুরসম শতাবিক গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছিল,—সেই মহান নিকি চিত্তার সমলে তত্তে পরিণত হইল।

কাব্য-কল্যানের কলকর্ষ কোকিলের সুসুদূর কর্ষ—বাংলার রক্তে রক্তে
বাংলার বঙ্গালীর প্রাণের প্রতিধ্বক্তি ব্যক্ত হইত—সেই কলকর্ষ
চিরদিনের মত নীরব হইল ! বাংলার বাকী গিরিশচন্দ্রের চিত্তের
গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার লিখিত দগ্ধ হইল । সে ‘অতি অল্পম’ বাণীর
সুদূর বহু আর কি বাংলার প্রতিস্পর্শ করিবে ? পুরাতনের পুণ্য
লিখিত করিবার আর কি গিরিশের বাণীর-বক্তার দালালার বক্ষে কলকর্ষ
হইবে ?

যদুন্দনের ভাব্য—

“বিস্মিষ্ট প্রতিমা যেন দশনী দিবসে”

সকলে গৃহে কিরিলেন । সে দিন জাহ্নবীজোড়ে যে রক্তের ভঙ্গি-
শেষ ঘণিয়াছে,—বাংলার ভালো আর কখনও তেমনি বরণ্যস্ত
ঘটিবে কি ?

নটরাজ ! তুমি আজ স্বার্থহীনবিজড়িত নম্র অগতির সংশ্লিষ্ট কাণ
করিয়া দিব্যধর্মের পথিক,—তাই আজ তোমার জন্ম বাংলার প্রাণ
স্ববেদনার অধীত হইরাছে, তোমার বিয়োগে সজ্জকণী বাংলার কর্ষ
হইতে শোকের উজ্জ্বল ধ্বনি হইতেছে । আজ বুঝা তোমাকে
ভারতের পুণ্যভূমি হইতে নির্ঝাঁপিত করিয়াছে । তাই আজ আমরা
তোমার লভ্য বর্ষে বর্ষে অনুভব করিতে পারিয়াছি ! তুমি যে
বাংলার জন্মের কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিলে,—তোমার
বিয়োগে আজ আমরা তাহা হারজন করিতে পারিয়াছি, এতদিন পারি
নাই । আজ আমরা তোমাকে অনেক কালসংগে বিসর্জন দিয়াছি ;
কিন্তু পরলোক দিখানী হিন্দু আমরা—আমাদের মনে হয়,—তোমার
বুঝি বিনাশ নাই । তোমার আত্মা অবিদ্যর, তোমার আত্মার বাকী
সদয়, চিরন্তন, দীর্ঘত । ভাবের সমস্ত অজ্ঞেয় । বুঝা তোমাকে
একবার করিয়াছে, কিন্তু হরণ করিতে পারে নাই । বাংলার চক্ষে—

বাঙ্গালীর চক্ষের উপর তোমার ভাবে তুমি চিরদিন চিরদেহীপ্যমান থাকিবে। তোমার সম্বন্ধ তুলিবার নয়।

নাট্যশালায় জনদাতা! তোমার নাট্যাগার্য্য নাম দার্শনিক হইয়াছে; তোমার মাধবী সিদ্ধির অর্থ আদরণে মণ্ডিত হইয়াছে। তুমি বাঙ্গালীর নতুন জীবনের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছ,—কর্ম্মকান্ড, পরিশ্রমে, অবিদ্য-সংগামে কত বিকৃত বাঙ্গালীকে ভূমি, ভুট্টি, শাস্তি ও আনন্দভোগের নৈ আকর ভাণ্ডার দেখাইয়া দিয়াছ, বাঙ্গালীর নাট্যশালাশিখরে যে হিরণ্যর পতাকা উড়াইয়া দিয়াছ, বার এগাদে তাহা যুগযুগান্তর জুটু দারুক, তাহা কখনও যেন বিলুপ্ত না হয়। তুমি যে মহাশিকার বাঙ্গালীর উদীয়মান তরুণ সংগ্রামকে দীক্ষিত করিয়াছ,—তাহা সমগ্র জাতির হৃদয়ে জাগর, শিক্ষার বীজদ্বয়ে উৎকীর্ণ হউক। তুমি যে মহাকাব্যে সমগ্র বঙ্গ উদ্বেলিত উজ্জ্বলিত অশ্রুপ্রাণিত করিয়াছ,—বাঙ্গালীর নাট্য-শালায় সমস্ত বিবেচ, হিংসা, স্বার্থপরতা দ্ব্যন্ত বিলুপ্ত বিলুপ্ত করিয়া—সেই মহাকাব্যের উচ্ছ্বাস সমগ্র নাট্যমণ্ডল প্রাণিত করুক,—মটমটের নিকট ইছাই আদ্যের কামনা!



পৌত্র পরিজন পরিবৃত
কবিবর মশৌমোহন বসু ।

কবির মনোমোহন বসু ।

(সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী)

(ঐ প্রবোধচন্দ্র বসু লিখিত)

সন ১৯২৮ সালের আষাঢ় মাসে বুধবার শুক্লাপকর্মী তিথিতে চল্লিশ পরশবার অন্তর্গত ছোট আঙুলীয়া গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবি মনোমোহন বসু জন্মগ্রহণ করেন। কবিরের বাম্যজীবন বশোহর জেলার অধিপাতি "নিশিষ্ঠপুর" নামক গ্রামে মাতামহ আগ্রমে স্থাপিত হয়, তথায় পঞ্চম বৎসরের শিশু শুকুমহাশয়ের পাঠশালার অধ্যয়ন কালে "সুদীর পড়ো" রূপে সমবয়স্ক এবং নিজাপেলা বরোজোষ্টদিগকে পাঠশালার পাঠ পড়াইয়া শুকুমহাশয়কে সাহায্য করিতেন। ওমিয়াছি সেই অল্পবয়সেই তিনি গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতার কর্মমহিমায়ত হুত্ব কুর কবিতা রচনার দ্বারা তাঁহাদের মন হরণ করিতেন। গ্রামবাসীরা অল্প উল্লস শিশুর মস্তকে পাগড়ী বাধিয়া দিয়া শিশুসুখমিস্ত অজো-জোহিত দায়রায় মহাকারত আয়ুষ্টি গাথা পরম আনন্দ ও ভক্তিগহকারে শ্রবণ করিতেন। হুইজন আগ্রজের সহিত স্বভাবকবি দামকে ও হুইয়েহে পাঠশালার অধ্যয়ন ও গ্রাম্য খেলাধুলার বাম্যজীবন অতি-বাহিত করিতেন। সে সময়ে তাঁহাদের সহোবয়স্কের প্রতি অপরের ভক্তি ও ভালবাসার প্রগাঢ়তা দেখিয়া গ্রামবাসীরা সকলেই বিমোহিত হইতেন। পাঠশালার পাঠ সমাপনান্তে তিনি জননীর সহিত নিজ জন্মভূমি ছোট আঙুলিয়া গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন।

কবিরের ছাত্রজীবন অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। তখনকার শিক্ষা-প্রণালীর প্রসারতার সংকীর্ণতা নব্বও তিনি আপন কর্তব্যপর অঙ্গদগ

করনার্থে কোনরূপ বাধা বিহীন অতিক্রম করিতে কণমান্ত পশ্চাৎপদ হইতেন না। ভাগ্যবাসীর বিশেষতঃ বহুবাসীর চিরস্বপ্নের প্রাণঃ-স্বপ্নীয় মিঃ হেরার ও মিঃ হিচার্ডসন্স সাহেবের নিকট :ডেনি Hart Schoolএ বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। কলিকাতার General Assembly's Institution-এর প্রথম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে তাঁহার ছাত্র-জীবনে একটি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল ; নিয়ে তাহার বিবৃত করিতেছি ।

উক্ত বিদ্যালয়ে এইরূপ ঘোষণা হইল যে, উক্ত শ্রেণীর ছাত্রমণ্ডলী হইতে যে কোন ছাত্র কোন একটী নির্দিষ্ট বাল্যনাট্য প্রবন্ধ লিখিয়া যথোচিত স্থান অধিকার করিবেন, কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে একটি মূল্যবান স্বর্ণ পদক ও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ইংরাজী পুস্তক পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিবেন। পরীক্ষা সমাপ্ত হইল। অপর একটী উচ্চশ্রেণীর বালক সেই যথোচিত স্থান লাভ করিবেন, কর্তৃপক্ষমণ্ডলী হইতে এইরূপ স্থির হইল। কিন্তু তাহাতে বিদ্যালয়ের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হওয়ায় পরীক্ষকমণ্ডলী বুঝা মনোমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি পুনর্জিটারের তার কাছার দস্তে দিলে মতোবলাত কর ?” উক্তর পক্ষীয় প্রবন্ধ লেখক যুবকজয়ের সহপাঠীগণ বিশেষরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া পণ্ডিতপ্রবর রেভারেন্ড ডকবন্দেয়া মহোদয়ের নাম উল্লেখ করিলেন।

কিছুদিন পরে যুবক মনোমোহন একদিন বিদ্যালয়ের বাগানভাগে পদচারণ করিতে করিতে চিন্তা করিতেছেন যে “করিলাম কি—যদি পরাত হই তাহা হইলে এ স্থলে আমি আর কি করিছা হুং দেবাইব”। উক্তকাণ্ডী যুবকের আগের গভীর আবেগ যেন স্থলের প্রদান শিকক ভাঙনার ভগিন্ধতি (Dr. Ogilvie) বুকিতে পারিয়াই ঠিক সেই সময়ে তাঁহাকে অদ্ভুত সঙ্কেতে আহ্বান করতঃ করিলেন “Well Mohun”

here is the result. I see you stand first")। (অর্থাৎ—
“দেখুন! পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে—তুমি সর্বোচ্চস্থান অধিকার
করিয়াছ।”) চতুর্দিকে হুহুপুল পড়িয়া গেল।

যেটি কথা Rev. মহাপ্রভুর অভিমত জাপনে এইরূপ মতাবলম্ব প্রকাশ
করিয়াছিলেন যে “বনোবোহন বাবু নামক যুবকের প্রথম অতিশুদ্ধত
হইয়াছে কারণ এই প্রবন্ধে স্নান প্রদান করা নাই; সহজ বোধগম্য ও
প্রচলিত শব্দবিক্রাসে আমি এই প্রবন্ধটিকে সর্বোচ্চ স্থান প্রদান
করিলাম।” অন্তঃপুর নির্ধাচিত্ত দিবসে কর্তৃপক্ষ ও পরীক্ষকমণ্ডলী
টাইমনহলে সমবেত নিমন্ত্রিত বিদ্বজ্জন ও দেশস্থ সন্ত্রাস উচ্চপদস্থ
ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে তাঁহাকে সেই মূল্যবান স্বর্ণ পদক দান ও নির্ধাচিত্ত
পুস্তকগুলি প্রদানান্তর উৎসাহিত করিলেন। উক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে
এক বানির নাম হ্রস্ব আছে—Walker's Dictionary.

কবিবরের যুগান্ত ৬ চন্দ্রশেখর গঙ্গুল মহাপ্রভুর ছোট জাণ্ডলীয়া
গ্রামের একজন বিশিষ্ট সন্ত্রাস ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ছোট
জাণ্ডলীয়ায় বাস জন্মে সর্বদাই নামাধি কিয়া কল্যাণ হইত;
কবিবর অতি অল্প বয়সেই পিতৃহীন হইলেন। বৃদ্ধ যুগান্ত মহাপ্রভুর
অপুত্রক মিত্রজন কবিবরও তাঁহার সাহায্যস্বপ্নকে অদ্যতানির্ধে
লালনপালন করিয়াছিলেন। পরস্পর জ্ঞাতাশ্রয়ের মধ্যে একদা
সন্ধান ছিল যে তাহা একালে গ্রাম পরিলক্ষিত হয় না। যুবককে
বাল্যকাল হইতেই কবিতা ও সঙ্গীতাদি রচনাশ্রয় দেখিয়া বৃদ্ধ যুগান্ত
এবং তত উৎসাহ প্রদান করেন নাই; কিন্তু ক্রমে যুবকের চতুর্দিকে
সুশ্রী স্ত্রী ও রচনাচাতুর্য্য দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ অনুভব
করিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে সাহিত্যসেবা কার্যে বণ্ণেই উৎসাহ প্রদান
করিলেন।

তাঁহার পর হইতেই তিনি নির্ভয়ে সাহিত্যসেবা ও সঙ্গীতাদি

রচনার সুবিধা পাইলেন। আবার সেই সময়ে সরস্বতীর বরপুত্র স্বর্ণপত্র কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র ঙ্গ, সাহিত্য-সনাত অক্ষয়কুমার বসু, কবিকল্প মহাশয় বেবেপ্রনাথ ঠাকুর, স্বনামধন্য চিত্রসরসীর কালীপ্রসন্ন সিব মহোদয়গণের সহিত তিনি বিশেষরূপে পরিচিত হইলেন। তিনি এই সুযোগে সাধনপথে “প্রত্যাকর” ও “অববোধিনী” পত্রিকার মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল; ঙ্গ কবি সুবল মনোমোহনের ক্ষমতায় পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে প্রিয় শিল্পরূপে আশ্রয়িত করিলেন। কিংবদন্তি মতে কবিবর স্বয়ং “বিভাকর” নামে এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করিলেন।

ইহার মধ্যে আর একটি অসামান্য ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কবিবরের সাহিত্য জগতে উজ্জ্বল পথ আরম্ভ হ্রস্বপিক্ত হইল। তাঁহার আবাল্য সখা, সম্পর্কে ক্রমিক, পরে কলিকাতার প্রবিশনামা Ernsthausen Oysterler কোম্পানীর book keeper ও ফেল-নোহন মিলের সহিত বালকোচিত চলনতাপ বশবর্তী হইয়া ৮ কাশী-রাসে যাত্রার সূচ্যে উপস্থিত হইল। আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে তখন কেবলমাত্র দায়ীপত্র পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে; তদ্ব্যতঃ পর যাত্রাবয় গরুর গাড়ীতে বাইতে হইত। সেকালে তাঁর ভ্রমণ করিতে হইলে লোকে বাচী হইতে উঠল করিয়া যাত্রা করিত। তাঁহার সে সমস্ত ভ্রমণ কষ্ট সহ্য করতঃ ৮ বারাগণী নামে উপস্থিত হইলেন। তথায় পিতা দেখেন যে বাবালীটোলার ৮ ঙ্গ কবিও তখন বৃদ্ধ শাস্ত্র। ৮ ঙ্গ কবিকে পাইয়া তৎকালর বাবালীরা একেবারে একটি স্তম্ভীতসংগ্রামের ভিত্তি বজ্রপরিবর্তন হইলেন। কিন্তু ৮ ঙ্গ কবির সহিত প্রতিযোগিতা সাংগ্রেমে সন্দ্বীপন হইতে কেহই সাধনা হইলেন না। মনোমোহনকে পূর্ন হইতেই ৮ ঙ্গ কবি প্রিয় শিল্প রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্মৃত্যায় তিনি সেই সংগ্রামের দুই

একটা বিশিষ্ট পাঠ্যকে ইনিতে জানাইলেন যে আমার এক গ্রন্থ শির
৬ নামে সুসুগৃহীত। তোমরা তাঁহাকে সম্বলত করাইতে পারিবে
আমার কোন আপত্তি নাই। সেই সংবাদ প্রবণে তাঁহার্য যেন
আকাশের ঠাঁর হাতে পাইলেন। মনোমোহন এসময়েই এ প্রত্যয়
ক্রমে দিশ্রিত ও নিচলিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ সবা
৮ ক্ষেত্রমোহন মিহ্র বহাশয়ের একটা দ্বিত্তি ও উৎসাহকরক
প্ররোচনায পরিশেষে সম্বলত হইলেন। উক্ত শব্দেই মহলা বুধ
দ্বায়ে চলিতে লাগিল; আলর বুধ জনকাল হইল; বিভিন্ন প্রদেশীয়
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সম্বলত জন সংলগ্ন লাগ্রাম কেন্দ্রে শোকা আরও
পরিবর্দ্ধিত হইল। গান বাণীনা ওজনকার মিলে যতদূর সম্ভব অত্যাক-
রূপে গঠিত হইল। পরিশেষে ভাগ্যবিনয়ীয়ে ৮ গুণ কবি হোদ্যেভের
ক্রায় শির শিরের হস্তে পরান্ত স্বীকার করিলেন; কবি মনোমোহন
জনন সম্বলত ফণোলে ও রোমান্সিত কলেবরে সেই বিস্তীর্ণ লাগ্রাম
ক্ষেত্রে ভ্রমবেবের পদবুলি গ্রহণ করিলেন। ৮ গুণ কবি লাগ্রামে বিনয়
বুধকের সম্বলত হস্তার্পণ পূর্বক আশীর্বাদ করিলেন যে “আমার
আশীর্বাদে তুমি প্রতি সম্বলতসংগামক্ষেত্রে দিশ্রিত হও।” অমত
কবির এ অবিকার্য বাণী বর্জ শতাব্দী ধরিয়া সফল হইয়াছিল কিনা তাহা
সম্বলত সম্বলত পাঠক পাঠিকা মাতেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন।
হদি কাহারও একবার আত্মা ছাপনে বিলম্ব ঘটে, আমরা তাঁহাদের
বেদল খোঁচবেদল সাইপ্রোয়ীর স্বনামংক সম্বলতিকাণী প্রীতুত ওজনল
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রকাশিত “মনোমোহন দীপাবলী” সম্বলত
একবারও পাঠ করিয়া তাঁহাদের সম্বলত প্রকাশ করিতে অহরোধ
করি। সেই দীপাবলীর মধ্যে পাঠক পাঠিকা আরও দেখিবেন যে,
বে অদেশী আশোলম সম্বলত হইয়া এমন হিমচল হইতে সুবাসিকা
পবীত পূর্ণ ভারতভূমি আন্দোলিত,—সেই পরিবেশে অদেশী জ্ঞাত পাশনের

কি সুন্দর ভুক্তি তরু আবেগ, উৎসাহবাদী, স্বদেশের প্রতি নিঃশঙ্ক
কর্তব্যতা, ও বৈদ্যবাসী কর্তব্যপালন ইত্যাদির পূর্ণাভাষ পূর্ণ-
সুন্দরতরপ পুস্তকীয় ভর বন্দার পূর্বে কিরণে ধোঁয়াত ও সন্নিহিত
বহিয়াছে ! বহুবাঙ্গারের প্রাথমিক অবৈতনিক নাট্যাশালায় এক লিখিত
ও অভিনীত অমর কবির “হরিপদ” নামক পৌরাণিক নাটকে তাঁহার
অমৃতময়ী লেখনী হইতে সেই মন বিখ্যাত সমীত “দিনের দিন সবে
কীম হয়ে পরাধীন” বাহির হইয়াছে তাঁহার স্বদেশ ভক্তি বন্ধনে অধিক
পরিচর এদান বাহুল্য মাত ।

অমর কবির নিজ গ্রাম ছোট আঙুলিয়া তখন উন্নতির ভরম সীমায়
উপস্থিত । গ্রামবাসিনকে ভ্রমভার কালে লোকে আদর্শ গ্রাম বলিয়া
নির্দেশ করিতেন । গ্রামের মধ্যে প্রকৃতই যের স্বায়ত্ত শাসন (self
government) প্রথা প্রচলিত । জল, পথ, বাট, ভবনালয়, সন্ধ্যা ও
অশিক্ষিত গ্রামবাসীগণের সুন্দর সন্ধ্যা আঙুলিয়া,—সকলেরই স্বদেশ
এক প্রাণতা, গৃহপার্বণে, জিহা কলাপ প্রভৃতিতে গ্রামবাসি আদর্শরূপে
রাজপুরুষগণ কর্তৃকও পুনঃ পুনঃ এবং কলিকাতার পত্রিকা প্রভৃতি
দৈনিক পত্রে বহুবার দীক্ষিত হইয়াছে । এতদূর উন্নতির পথ বধা
প্রসাধিত, তবায় যে একটি অবৈতনিক নাট্যাশালা সংস্থাপিত হইবার
এতদূর উদ্ভিবে ইহা আর বিচিত্র কি । গ্রামস্থ সুবকস্বন্দ সকলেই
ভ্রম উন্নতশীল উপায়কম এবং সমাজ সংস্কারক ভ্রমে দীক্ষিত । কবির
সেই দলের একজন নাথক বিশেষ । তাঁহার কবিতা রচনার কদমতাও
ভ্রম প্রণব । সুতরাং একখানি নাটক রচনার ভার তাঁহারই হতে
অর্পিত হইল । কবির কবিগুরু বাজীকির সপ্তকান্ডের কদ পায়প
যাহা ভারতবর্ষের কাব্য কবিতার বীজবৃক্ষ বন্ধন, তাহারি একটি পদ
মাত্রকে প্রায় করিয়া সুপ্রসিদ্ধ “সামান্তিক” নাটক লিখিতে আরম্ভ
করিলেন । নাটক রচনা সমায় হইল ; সকলে পাঠে অভ্যস্ত আনন্দ

অনুষ্ঠান করিলেন। “দ্রামাভিনয়ক” নাটক সংক্ষেপে ১২৭৪ পালের “প্রকাশক”, “সোম প্রকাশ”, “একুশেবন গেজেট”, “ভারত রজনী”, “চাকা প্রকাশ” ইত্যাদি বহু সংবাদপত্রে আপন মতামত প্রকাশ করিলেন; যেটি কবী সকলে একবাক্যে প্রত্যক্ষ উচ্চ প্রশংসা করিলেন যে প্রকাশক সংগ্ৰহ কখন বুঝিতে পারিলেন যে নাটকখানি অতি উচ্চ মরের হইয়াছে। বহুতাই তখনকার অধিকাংশ নাটকেই স্থান বিশেষে অতি ক্ষুদ্র ভাবে অন্তর্ভুক্ত হইত। সুতরাং তদ্ব্যবস্থা গ্রহণ করিল জীলোকের পাঠের পক্ষে উপযোগী হইত না। কিন্তু মনোমোহন বাবু অশ্রীল বিধরের সমাবেশ ভিন্ন ও যে হস্ত রনের উদ্বোধন করা যার ভাষা প্রমাণিত করিয়া ও সে রীতি একেবারে পরিভাগ করিয়া নাটক-খানিকে অতি মনোহর করিয়াছেন ইহা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিলেন। স্বাভাবিক কবির শক্তি না থাকিলে নাটক লেখা বিড়ম্বনা যাত্র। প্রাণবাসনা, রাজভক্তি, নিষ্ঠামাতা ও পুত্রের পরস্পর ঘেহ-ভক্তি, রাসীদিগের কণ্ঠ ও নিষ্ঠুরাচার নিবন্ধন পুরুষীকণের মত পরিবর্তন, বরবিবাহ বৃত্তার কারণ, জাত্মরোগ, জোরের প্রতি অকপট ভক্তি, দাম্পত্য-প্রণয়ের পরাকর্ষ্য প্রভৃতির মিনতি দ্রামাভিনয়ক নাটক যে অনন্তকাল পর্যন্ত হিন্দু সমাজের আদর্শ অঙ্গ হইয়া রাহবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

নাটকখানি ছোট জাঙলিয়া গ্রামে অভিনীত হয় নাই; সেই সময়ে মুক্তিগত উপস্থিত হওয়ার সংগৃহীত অর্থ ভরণ্যে ব্যয়িত হইয়া কত জমিগার অকাল মৃত্যুর কারণ হইতে রক্ষার কারণ হইয়াছিল। তৎপরে নাটকের সৌরভ চতুর্দিকে পরিবাপ্ত হইয়া মাত্র বঙ্গের শত শত গ্রামে অভিনীত হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু সুবিখ্যাত বহুবাজার ও প্রবীণ নাট্যাভিনয়সমাজ যেরূপ অলঙ্কার ও নিপুণতা সহকারে ইহার ও গ্রন্থকারের পরমর্শী নাটকবর্ষের অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন

সেইরূপ আর কোন সংগ্রহই করেন নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নাট্যকথানির পুনর্জাগরন আবশ্যক হয়। সুনিয়মিত প্রথম সংস্করণ অবশিষ্ট বইবার উপক্রম হওয়ায় পুস্তক বিক্রয়কারী প্রতি খণ্ড ২ টাকা বা ততোধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল।

মনোমোহন দ্বাদশকাল হইতে স্পষ্টবাকী নির্ভীকচেতা ও স্বাধীন প্রকৃতি ছিলেন; পরেও দানব জাহার দ্বারা ব্যক্তিগত দ্বারা সন্তুষ্ট নহে। কলিকাতায় কোন প্রসিদ্ধ হাউসের অতিথিদিগে স্বরূপ কথাকে কুসুম মূল বলিয়া জ্ঞাত টাকা সহরে বাইতে বইয়াছিল। সেইখানে কলিকাতা অবস্থিতিকালীন তিনি জাহার দ্বিতীয় উচ্চম "প্রবর পরীক্ষা নাটক" রচনা করেন। প্রবর পরীক্ষা নাটক অতি দক্ষতার সহিত সুবিধায় "স্টার থিয়েটারে" বহুবার অভিনীত হয়। ইং ১৮৭০ খ্রীঃ ১২ই ডিসেম্বর তারিখের হিন্দু পেট্রিরটে চিরস্মরণীয় স্বর্গীয় কলকাতা পাল মহাশয় কলিকাতার পুস্তকখানের সমালোচনাকালে উক্ত পুস্তকের শ্রেষ্ঠতা প্রতী-
 পন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে "বঙ্গদেশে এতদিন পরে জী পাঠা নাটকের অভাব মোচিত হইল। প্রবর পরীক্ষা প্রথম হইতে উৎকৃষ্টতর; কারণ ইহা প্রথমবার স্বকল্যাণ করিত চিত্রালেবীর সাহায্যে লিখিত; কোনরূপ সাহায্য গল্পের ভিত্তিস্বরূপ কোনদ্বান হইতে লাহরন না করিয়া তিনি পুস্তকখানিকে এরূপ শিক্ষাপ্রদ সুবিস্তৃত ও বহুবিধাধের অনর্থ সমর্থিত করিয়াছেন যে পাঠ করিলে সুখপৎ চমৎকৃত ও বিস্মিত হইতে হয়।" তাৎপরে তিনি স্থলের সহজ পাঠ্যের অমায় বিবেচনার্থ "পদ্মমালা" প্রণয়ন করেন।

আধুনিক উন্নতিশীল সংগ্রহকারের নিকট "পদ্মমালা" পরিচর প্রকাশ নিত্যক অনাবশ্যক গবেচনা করি। স্বাধীন জাতির নিকট যৎপরনায় এই পাঠ্য পুস্তক যে জাতীয় সম্প্রদায়ের পরিগৃহীত হইবে ইহা কারে বিচিৎ কি! ইহার প্রবন্ধগুলি সরল ভাষায় রচিত, তাহার

উপর মধ্যে মধ্যে কাব্যসাহিত্যিকতার ধারায় একতাই একে এক বালকের কণ্ঠে ইহা স্ফূর্তি কঠোর করল। প্রেক্ষার ইহার ১৪ ও ১৫ ভাগও প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

মনোমোহনের বহুত্বের বিরুদ্ধে বক্তৃতাগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়া বহুতা-মালা নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়। নবীন মাত্রদ্বারস্থ ব্যক্তিগণ মধ্যে দীক্ষার্য্যে বোদ্ধাজিজ্ঞাসার জায় দিলু আচার ব্যবহারের বিবর্তনকরণ করিতে হুঁত নহেন তাঁহারা তাঁহার “হিন্দু আচার ব্যবহার” নামীয় বক্তৃতাটি পাঠ করিলে বুঝতে পারিছেন যে কি অস্বতীর যুক্তি-প্রয়োগে তিনি হিন্দু-মতাদ্বৈতবিত্যার পবিত্র্য প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ ছিল, সময়েচিত্তে লোক জনের বিচার-অপকপাতে প্রদর্শন করাইয়া তাহাতে নানা রবের অবতারণা পুঙ্খক-প্রোত্তার জলরূপীভূত করিতে তিনি অস্বতীর ছিলেন; সত্যজ্ঞানে বক্তৃত্তাপে তিনি দস্তাযমান হইলেই বিশাল প্রোত্তরুদ অধনি আনন্দে উৎ-ফুল হইয়া উঠিতেন। তাঁহার স্বাক্ষরে স্মৃতি-বিজ্ঞানমোচিত হাতেরসের অক্ষরস্ত নিষ্ঠুরিণী সর্গদা সংবলিত থাকিত। প্রেক্ষার “সত্যীনাটক” বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারের একটি অতুল্য রত্ন বিশেষ। বহুকালের পুণ্যতন উপাদান দ্বারা যে একজন অভিনব প্রাণীর দৃষ্টকাণ্ড শলীবদ্ধপে প্রবর্তিত হয় মনোমোহনই তাহার প্রথম পথ প্রদর্শক। সত্যীনাটকের ভাষা ও রচনা-প্রাণী অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের স্বপ্নস্বপ্নরূপ, শিবের শিবত্ব, নান্দের চরিত্র, সত্যের পাত্তিত্ব, দক্ষের রাজপদমৌহব, ভদ্রসীমগণের মহোদরার প্রতি ঘেহ, ঐর্ব্য ও আদ্যোদয়, ঐশ্বর্য্যের কল্পাব্যবস্থা, লাভ্যরানের বিকারপুত্র ‘ইট’ সিদ্ধি সমূহ একজন পরিপাটি-রূপে চিত্রিত হইয়াছে যে পড়িতে পড়িতে আশ্চর্য্য হইয়া অতীত যুগের সলীল চিত্রাবলী সম্মুখে প্রতিফলিত হইতে থাকে। সত্যীনাটকে প্রকৃতি প্রাণ-নন্দিনী সত্যীর আশ্চর্য্যবস্তুর মতোষ ও সৌরভ জনে

সুখে দুঃখে সমভাবে, পতির প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি এবং পিতা-কণ্টক পতি মিল্লা প্রবণে পিতৃবত আত্মদেহ বলিবান বাবা শান্তি স্থাপনের পূত্ৰ তাৎপৰ্য্য ইত্যাদি এত সূক্ষ্মরূপে চিত্রিত হইয়াছে যে তাহার জুলনা সম্ভবপর নহে। সর্বোপরি সত্যী নাটকের শাস্তোপাশলা গ্রন্থকারের ও বঙ্গসাহিত্যের এক অপূৰ্ণ, উপাদেয় ও সম্পূর্ণ নুতন স্থলী। এরূপ লংগো-উদাসীন ও সাধু চরিত্র অতন বঙ্গসাহিত্য জগতের আর দ্বিতীয় আছে কিনা সম্ভেদ।

বরহাঙ্গারস্থ অবৈতনিক নাট্যসভায় কর্তৃক অহরহ হইয়া গ্রন্থকার “সত্যী” ও “হরিশ্চন্দ্র” নাটক প্রদর্শন করেন। উভয় গ্রন্থই তাঁহার অতি যোগ্যতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। অত্যধিক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকারপূর্বক তিনি একটা চিত্র বিনোদন নাট্যশালা স্থাপনে পরায়ত্ত্ব করেন নাই। এই অভিনয় দর্শনার্থ লোকের ও সুশিক্ষিত দর্শকবর্গীগণ অতি আগ্রহ প্রকাশ পূর্বক রঙ্গালয়ে উপস্থিত থাকিয়া সন্মতিক উপসাহ প্রদান করিতেন। রঙ্গালয়ে প্রবেশাধিকারের টিকিটের আবেদনের সংখ্যা সময়ে সময়ে এত অধিক হইত যে নাট্যমানবরের কণ্ঠস্বকণন সকলের আগ্রহের সকল সময়ে রক্ষা করিতে না পারিয়া বিশেষ যত্নাভ্যাস হইতেন। স্ত্রী ভূমিবাগলি পুরুষের দ্বারা অভিনীত হইত বটে; কিন্তু এত আত্মবিক হইত যে কোনরূপ ভ্রুটি বা ভ্রম পরিগণিত হইত না। অভিনয়, গান, ঐক্যতান বাবন অতি সুন্দর-রূপে নিকাহ হইত।

১৮৮১ সালের পৌষ মাসে কবিবর “হরিশ্চন্দ্র” নাটক প্রদর্শন করেন। এই পৌরাণিক প্রতথানি নাটকীয় বহু সৌন্দর্য্যের আধার; ইহার এক নিকে গ্রন্থকারের লিপি চাতুৰ্য্যবশে আদর। স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই—যেন সত্যীরহর চিত্রাঙ্গদোবরে প্রাচীন আবার্দ্ধিদের নামসংহন মগানকে কেলি করিতেছে; তাহারই নামে তাঁহার পরিবৃত্তবান নিশ্চয়ের, কি

অতীজের মানবমনের গুহময় অগভীর বস্তু কবী সুব্যাবহিক চিত্রিত করিতেন—আহা। সেই শক্তি বিচ্যুত হইয়া আধুনিক আধুনিকতার সেই যথাগুরুত্বপূর্ণ বর্ণিত ব্যাপার আর পুণিতে সমর্থ হইতেছেন না—বিচ্যুত মনোমোহন সকল অলৌকিক গ্রন্থাপন জান করিতেন। কিন্তু মনোমোহনের মৌলিক ভূমিকার সেই প্রাচীন তথের নিত্যগ্রহণ কিংবা মাত্র প্রতিফলিত হওয়ার নটকীয় চরিত্র অতন পূর্ণতা লাভে সমর্থ হইয়াছে।

গ্রন্থকারের দলীর পবেখনার কলেই তাঁহার হস্ত হইতে ব্রহ্মবিদ্যামিত্র একটি কিছুতাকার নাটক দুর্দান্তরূপে বাহির না হইয়া বিদ্যমণ্ডলের পরম মিত্র ব্রহ্মবিদ্যারই প্রতিভাসিত হইয়াছেন। মনোমোহন মানবমনের গুহময় তত্ত্ব বুঝিয়া তাঁহার “কমলার” সৃষ্টি করিয়াছেন। কমলা সাংখ্য প্রীতিক্রমণী মানবদেহে ধাবিতী দেবী প্রতিমা। প্রতিমার পাইলে ভালবাসি, এ কথা তিনি বলেন না। “আমি বাহ্যকে ভালবাসি সে আমার” এ কথাও তিনি বুঝেন না। “আমি বাহ্যকে ভালবাসি,—সে আর আমি এক আনন্ডে তাহাতে ভেদ নাই; সে যাহা আমি তাহা”—এই মহাদেশী এই মহোদীক্ষিত। একপাশে পুণ্ডরীক মনোভাবকে সূক্ষ্মমান করিবার শক্তি মনোমোহনের ভূমিকার সম্ভবপর; নচেৎ আধুনিক বিজ্ঞানী ভাবান্তর বাহ্যিক সাহিত্যে এ চিত্র একান্ত দুর্ভাগ্য। বস্তুতঃই কবির “কমলার” অলৌকিক প্রেমচিত্র অতন এক অপূর্ণ হৃদয় ব্রহ্মময়ী ত্রিগুণ বিবেক। সকল চরিত্রে সমালোচনার স্থান সমাবেশ এ ক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে। কমলায় সন্মুখের রাজ্য চরিত্রের ও ধর্মপরাধ্য পত্রিতা শৈব্য রঙ্গী লজ্জা পালনের অন্ত যে কতকগুলি বার্ষিক বিপর্যয়ে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা গ্রন্থকার বেঙ্গল ভাষায় নিশিবেদ করিয়াছেন তাহা একটাই অতি পুণ্ডরীক শিক্ষাগ্রহ। গ্রন্থকার “পার্ব পতাকার” ও “মনোমোহন” নাটক দুইপরে

প্রণয়ন করেন। ১২০৯ সালে এম্বারেড থিয়েটারে অভিনয়ার্ণ অঙ্কন করিয়া "দাসনীলা" নামক গীতিনাট্য প্রণয়ণে বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। মোটের উপর প্রাচীন পৌরস্বত্বের মধ্যে বাহ্যিক পৌরস্বত্ব কল্পনার পুণ্য কাননে প্রবেশ করিয়া অটল অবস্থিতির নিশ্চিন্ত পুণ্যে নাটক রচনা করিয়াছেন প্রাচীনগণের মধ্যে মনো-মোহনের স্থান যে অতি উচ্চে অবস্থিত, ইহা সন্দেহাতীত।

পাঞ্জাবদেশের মহাবাজা রণজিৎ সিংহ সংকলিত ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া মনোমোহন এক অল্পক "হুলী" নামক ঐতিহাসিক নবজাগরণ রচনা করেন। উপর্যুপ বহু নারিকার চরিত্র অঙ্কন এতদূর প্রমাণিত ও সুশীল হইয়াছে যে প্রত্যেককে আত্মিক ধরাদ ও প্রাণের না করিয়া ফাক দাঁকা যায় না। একেত্রে বিশ্বচি-অতি প্রকৃত ও উত্তমক রাজকীয় সমস্তায় পূর্ণ, তাহার উপর নবজাগরণের নানা চরিত্র সমাবেশে পাঠকের পাঠের একান্ত উপযোগী হইয়াছে। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া মোত-স্বপ্নমণ্ডল হইল।

এই প্রবন্ধে ছাফ আখতারি, পাঁচালি, কবি প্রভৃতির গান সম্বন্ধে লিখিত সুবিধা ও সময় না পাওয়ায় লিখিত হইল না। বাস্তবিক সে বিশ্বের উল্লেখ করিবার ইচ্ছা রহিল।

নাট্যোচাৰ্য্য গিরিশচন্দ্র

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত।

১২৪০ বঙ্গাব্দের ১৪ই ফাল্গুন সোমবার কলিকাতা বাণবাৰাণসী
বহু প্ৰচাৰ গিরিশচন্দ্র জন্মগ্ৰহণ করেন। গিরিশ-
চন্দ্র ও চন্দ্র পিতার নাম ৩ নীলকমল ঘোষ; তিনি
শৈশব-কাহিনী। সন্তান কামতুলসীদেব—বাণবাৰাণসীৰ অধিবাসী।

গিরিশচন্দ্র পিতার অধ্যায় পুত্ৰ। জননীৰ অষ্টম গৰ্ভজাত সন্তান। হিন্দু
বিধান—অষ্টমগৰ্ভজাত সন্তান সৰ্বজেনাশ্ৰয় সৰ্ববিভাবিধ্যৰে স্বনাম-
জ্যোত সৰ্ববিশুদ্ধকীৰ্ত্তি হইয়া থাকেন; এই বিশ্বাসৰে অষ্টমগৰ্ভজাত
সন্তান—পিতামাতার আত্মবিক গ্ৰিয় হয়। গিরিশচন্দ্রের অধুৰে এ
শৌখিন্য ঘটিয়াছিল। তিনি পিতামাতার বড়ই আদৰেৰে সন্তান
বৎ। গিরিশচন্দ্র অতি শুভদিন ও শুভময়ে জন্মগ্ৰহণ কৰিয়া-
ছিলেন। যে দিন তিনি জন্মগ্ৰহণ করেন, সেদিন শুক্লপক্ষৰ অষ্টমী
তিথি; শুক্লপক্ষৰ অমল বঙ্গ চন্দ্ৰেৰ তিৰণদ্বান্ত হইয়া বঙ্গ-চন্দ্র
গিরিশচন্দ্র বরাধামে আবতীৰ্ণ হইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের পিতা একজন শ্ৰমিক, 'বুক কিপাৰ' ছিলেন। এই
কাৰ্য্যে তিনি অসাধারণ দক্ষতা ও আভিষ্ঠাৰ আধিকাৰী হইয়াছিলেন।
গিরিশচন্দ্রের উপরে জ্যেষ্ঠ ভ্ৰাতা ও কতকগুলি ভগিনী ছিলেন। কিন্তু
জ্যেষ্ঠাণ্যক্ৰমে ভগিনীগুলিৰ মধ্যে অনেকই শৈশবে লোকাভ্যন্ত
হয়। পাঠশালাৰ পাঠ সাধ কৰিয়া গিরিশচন্দ্র যখন ইংৰাজী বিদ্যালয়ে
শিক্ষাৰ্ণ গমন কৰিলেন, তখন গাঁহাৰ বয়স সাত বৎসৰ মাত্ৰ। প্রথমে
গিরিশচন্দ্র গৌৰমোহন আচাৰ্য্যৰ হুঁজে ভৰ্তি হন।

অষ্টমদর্ঘ বয়সে গিরিশচন্দ্র ভীষণ আত্মশোক প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার বেহমর অগ্রজ পিতামাতাকে কানাইর, অশ্রুজের মেঘপাশ হিন্ন করিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। নিদারুণ আত্মশোকে গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন।

শৈশব হইতেই গিরিশচন্দ্রের শিউলগরে ভাবের বিকাশ হইয়াছিল।

শৈশব হইতেই তিনি গান ও কবিতা শুনিতে শৈশবে আর-বিকাশ।

অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। রাজা দিরা কেমন দিয়ারী পাছিয়া গেলে, তিনি নিবিষ্টচিত্তে তাহা শুনিতেন। বিজ্ঞ-জ্ঞের পাঠেআসে গিরিশচন্দ্র কাবুশ মনোযোগী ছিলেন না, বিজ্ঞ রানায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঠে তাঁহার আগ্রহের সীমা থাকিত না; তিনি অতি শৈশবেই রানায়ণ ও মহাভারতের অনেকাংশ কর্তৃত্ব করিয়া ফেলিয়াছিলেন। শৈশবকালে গিরিশচন্দ্র তাঁহার পুত্রপিতা-মহীর নিকট রানায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ-বর্ণিত আখ্যায়িক নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেন। পুরাণের গল্প শুনিতে পাইলে, তাঁহার আর আত্মাদের সীমা থাকিত না। পুরাণের গল্প শুনিবার সময় নানা ভাবে তাঁহার হৃদয় আন্দুল হইয়া উঠিত। গল্প শুনিতে শুনিতে যখন তাঁহার মনে লগ্নে উঠিত, তখন তিনি সে লগ্নকে পিতামহীকে প্রেমের উপর প্রের করিয়া লগ্নেরহরকর করিয়া লইতেন।

একদিন গল্প করিতে করিতে পিতামহী বলিলেন,—“কক্ষ ব্রজপুরী ছাড়িয়া যথুয়া চলিয়া গেলেন।”

বালক গিরিশচন্দ্র সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“পাবার আসিলেন?”

পিতামহী বলিলেন,—“না।”

গিরিশচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আর আসিবেন না?”

গিতামহী বলিলেন,—“না।”

গিরিশচন্দ্র ব্যথিত হৃদয়ে তিনবার এই প্রশ্ন করিলে, উত্তরে তিন দ্বারই শুনিলাম,—“না।” তাঁহার কোমলপ্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন; তাহার পর গিতামহীর নিকট হইতে পলাইয়া গেলেন। ইহার পর তিন দিন আর তিনি গল্প শুনিতে আসেন নাই। ভোধ্যাক্ত কবি, ব্যাক্ত বা হাফ-আফড়াই হইলে, বালক গিরিশচন্দ্র সমস্ত বাধ্যবৈয় অতিক্রম করিয়া সেখানে নিরা উপস্থিত হইতেন, নিবীড়চিত্তে শেষ পর্য্যন্ত শুনিতেন। এই হাফ-আফড়াই হইতেই গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে কাব্য-রস-বিকাশের সূত্রপাত হয়; এই উপলক্ষেই তাঁহার অন্তরে কবি হইবার দাঙ্গা অদ্বুরিত হয়।

বাগবান্দারের সন্ন্যাস্ত অধিবাসী অর্থীঃ ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে একদিন হাফ-আফড়াই উপলক্ষে মহা বৈশেষের আয়োজন। সমারোহ হইতাহে। আফড়াই হলে অসংখ্য লোকের সমাগম হইতাহে; নিমন্ত্রিত গল্প ব্যক্ত বরোধ্য ব্যক্তিগণকে অতি কষ্টে পথ কবিরী লইয়া জনতা ভেদ করিয়া আসরে গিয়া বসিতে হইতাহে,—এমন সময় সামান্য পরিচ্ছদধারী অনৈক ভ্রমলোক ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার আগমনে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে তুলন হইকোলাহল ও অভ্যর্থনার ধুম পড়িয়া গেল। জনতা আপন আপন অংশস্বত্ব হইয়া তাঁহার প্রবেশের পথ করিয়া দিল, শত শত সন্ন্যাস্ত ব্যক্তি ছুটিয়া আলিয়া মহাগমারোহে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে আগরের মহাঘূষে লইয়া গিয়া বসাইলেন। বালক গিরিশচন্দ্রও পূর্ব হইতেই এই আসরে আসিয়া আফড়াই শুনিতে বসিয়া-ছিলাম। সাধাত পরিচ্ছদধারী নগণ্য ব্যক্তির এই প্রকার মহা অভ্যর্থনা দেখিয়া তিনি তাঁহার পরিচয় জানিবার জর ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তখনই তিনি জাদিতে পারিলেন—আগন্তুক কবির

ঈশ্বরচন্দ্র। কবির এই প্রকার খ্যাতির বোঝা বালক গিরিশচন্দ্রের মনে মনে কবি হইবার বাসনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। ইহার পরই তিনি কবির ঈশ্বরচন্দ্র সম্পাদিত “প্রভাকরের” গ্রাহক হইলেন। এই সময় হইতে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের আদর্শে প্রায়ই কবিতা রচনা করিতেছেন, বহুবার গল্পগল্পে জনাইতেন, তাহার পর আবার ছিড়িয়া ফেলিয়া দিতেন।

গিরিশচন্দ্র যখন একাদশ বৎসরের বালক, তখন তাঁহার দেহময়ী জননী স্বর্গারোহণ করেন; ইহার তিন বৎসর পরে চতুর্দশবৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্র পিতৃহীন হইলেন। বালক গিরিশচন্দ্র চতুর্দশ বৎসরেই অতিভাবক শূন্য হইলেন। মাথার উপর রাখিলেন একমাত্র ছোষ্ঠী ভগিনী; তিনিই বালক গিরিশচন্দ্রের পিতৃব্যতীর স্থানে অধিকার করিলেন। কিন্তু পিতৃব্যহীন বালকের ভগিনীর দিকটী প্রবাসনা অপেক্ষা আদরই অধিক ছিল। এইরূপে অতিভাবক শূন্য হইয়া প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করিয়া, নব্ব্বদশবৎসর বয়সে পূর্ণ হইতে না বইতেই গিরিশচন্দ্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার বহুসংখ্যক উদ্ভেদনার, বিশেষতঃ তাঁহার প্রথম বহু লবঙ্গ ৬ ব্রহ্মবিহারী সোনের প্ররোচনায় তিনি গৃহে অবসর আরম্ভ করিলেন। প্রায় চারি বৎসর গিরিশচন্দ্র গৃহের দার রত্ন করিয়া, দিবারাজ পাঠ করিতে লাগিলেন। এই কয়েক বৎসর, গ্রহই তাঁহার প্রধান সঙ্গী ছিল। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের অবসারকালে ইংরাজী কাগজ পত্রাভিধান করিয়া চিত্তকুর্জিত করিতেন। বহুসংখ্যক পুস্তক ক্রয় করিয়া এবং “কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী”র গ্রাহক হইয়া, অনবরত পরিশ্রমে ইংরাজী সাহিত্যে তিনি বিশেষ অধিকার লাভ করেন। সেই ছাঁতে তাঁহার অধ্যয়নবীল জীবন শেষজীবন পর্য্যন্ত সমভাবে বহিয়া আসিয়াছিল। কলিকাতার এসিদ্ধ এসিদ্ধ পুস্তকালয়ের গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়াও তাঁহার

পড়িবার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি "এসিরটিক সোসাইটি"র বৈষ্ণব হইয়াছিলেন।

নিরীশ চন্দ্র শৈশব-রচিত কবিতাবলী রক্ষা করিবার কখনও প্রয়াস পান নাই; কবিতা রচনা করিয়া বঙ্গবাক্যবদিককে উপেক্ষা করিয়া শুধাইয়া তিনি ভুলি পাইতেন, তাহার পর সে সমস্ত কবিতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। আমাদের যখন আছে, প্রনামবদ্ধ নটকবি দ্বিতীয় অনুভবলাল বসু একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া-
ছিলেন,—“গিরিশ বাবু যে সকল কবিতা ও গান বাঁধিয়া নষ্ট করিয়া-
ছিলেন, সেগুলি যদি আমরা বহু করিয়া রক্ষা করিতাম, তাহা হইলে
বহুদিন পূর্বে কাঁচ হইয়া বাইতাম।”

গৃহে অধ্যয়নকালে গিরিশ আবু ইব্রাহীম কবিতার অনুবাদ করিতেন। প্রথমে তিনি অবিভক্ত অনুবাদ করিবার প্রয়াস পান, পরে স্বাধীন অনুবাদে প্রস্তুত হন। এই দুই প্রকারের দুইটি কবিতা ও তাহার অনুবাদ নিয়ে প্রবন্ধ হইল।—

(১) "Pope"এর "Eloisa to Abelard" হইতে—

In these deep solitudes and awful cells,
Where heavenly-pensive contemplation dwells,
And ever-musing melancholy reigns;
What means this tumult in a vestal's veins?

অনুবাদ—

অতীত নিবৃত্ত হেন জীবন মানিবে,
চিন্তাসহী দৃষ্টিমতী দিগ্বিদিক দ্বারে,
বিহরে বিধাবে যথা ভাবনা মগন;
কেন হেন বিরক্ত তপস্বিনী মন?

(২) John Gay "এর "A Ballad" হইতে—

'Twas when the seas where roaring
With hollow blasts of winds ;
A damsel lay deploring,
All on a rock reclined.
Wide o'er the foaming billows
She cast a wistful look ;
Her hand was crown'd with willows,
That trembled o'er the brook.
Twelve months are gone and over,
And nine long tedious days.
Why didst thou, venturous lover,
Why didst thou trust the seas,

অনুবাদ—

দেখাইতে আন্তর্গতি,	বেগে চলে আন্তর্গতি,
জলনিধি গরমে ভীষণ ;	
সজ্জাপিতা একাকিনী,	শিলাকূলে বিরহিনী,
হেরিলাম শরমে ভবন ।	
নয়ন-কমলে বারি,	করিছে দুকূতা সারি,
বিস্তার জলধি পানে চার ;	
বিবশা বজ্রিতা বেশ,	আকুল কুণ্ডিত কেশ,
মনোহর উড়িতেছে বার ।	
বৎসর হয়েছে পাত,	কর দিন তার সাথ,
প্রাণনাথ এল না আহার ;	
কেনহে কদম্ব ধন,	করিবে দারুণ পণ,
জলনিধি হাতে গেলে পার ।	

অবশেষে গিরিশ বাবু ইংরাজী কবিতার অনুবাদে স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন । মূল অধিকৃত দ্বাধিরা, অপ্রতিভ ভাবার মাদুরী রক্ষার দিকেই তাঁহার মনো নিবদ্ধ হয় । এই প্রকার রচনার দুটোস্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল ।

"Pope" এর "Indian Lover's Song" হইতে—

Hasten, love, the sun hath set ;
And the moon, through twilight gleaming,
On the mosque's white minaret,
Now in silver light is streaming.
All is hush'd in deep repose ;
Silence rests on field and dwelling,
Save where the bulbul to the rose
Is a love-tale sweetly telling.
Save the ripple, faint and far,
Of the river softly gliding ;
Soft as thine own murmurs are,
When my kisses gently chiding.

অনুবাদে—

এস প্রিয়ে স্বরাভরি, ভূবিল তিমির-অরি,
চন্দ্রোদয়ে গোধূলি ভেদিয়ে,
স্তম্ভ মঙ্গলিদের শির, শোভিত রক্ত নীর,
ধায় স্তম্ভ কিরণ বহিয়ে ।
নীরব সকল বব, নিদ্রিত মানব সব,
বুলবুল পাবী শুধু আগে,
প্রেমে পুলকিত হিয়া, খেলাপের কাছে গিয়া,
প্রেমকথা কর অনুবাদে ।

অবশেষে গিরিশ বাবু ইংরাজী কবিতার অনুবাদে যত্ন পূৰ্ব্ব অব-
লম্বন করিয়াছিলেন। মূল অবিচ্ছিন্ন রাবিয়া, অহুদিত ভাবার বাধুর্গ
দৃষ্টির দিকেই তাঁহার লক্ষ্য নিবদ্ধ হয়। এই প্রকার রচনার কুঠাঁড়
নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"Pope" এর "Indian Lover's Song" হইতে—

Hasten, love, the sun hath set ;
And the moon, through twilight gleaming,
On the mosque's white minaret,
Now in silver light is streaming,
All is hush'd in deep repose ;
Silence rests on field and dwelling,
Save where the bulbul to the rose
Is a love-tale sweetly telling.
Save the ripple, faint and far,
Of the river softly gliding ;
Soft as thine own murmurs are,
When my kisses gently chiding.

অনুবাদে—

এস প্রিয়ে স্বরাস্তরি, ভূবিল তিমির-অগ্নি,
চন্দ্রোদয়ে গোখুলি ভেদিয়ে,
গুহ্র নদজলের শির, শোভিত রক্ত নীর,
যায় গুহ্র কিরণ বহিয়ে ।
নীৰব সকল সব, নিদ্রিত মানব সব,
বৃন্দুল পানী শুধু জাগে,
প্রেমে পুলকিত হিয়া, প্ৰেমালাপের কাছে গিয়া,
প্রেমকথা কয় অহুলাসে ।

দুরন্তিত শোভনশী,

মহি মরি করে গতি,

আগে ধনী জিনিয়া সন্তান;

সেইরূপ যুগ হবে,

চুপন করিছে যবে,

ছি ছি বলি কিরাও বয়ান।

কুড়ি বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্র “অ্যাটকিনলন্ ট্রিলটন্” কোম্পানীর আফিসে শিকারবিদীৰূপে প্রবেশ করেন। ক্রমে তিনি “অ্যাক্টিভি মিডিয়” কোম্পানীর আফিসে সহকারী কেসিয়ারের সঙ্গে নিযুক্ত হন। ইহার পর তিনি আরও দুই তিনটি আফিসে কার্যা করিয়াছিলেন। হিন্দ-বিকাশে গিরিশ বাবুর বিশেষ দক্ষতা ছিল। শেষোক্ত আফিসগুলিতে তিনি বুদ্ধিগায়ের পদে কার্যা করিয়াছিলেন।

গিরিশ বাবুর বয়স যখন ২৫ বৎসর, তখন তিনি কতকগুলি বঙ্গীয় সহযোগীতার বাগবাঝারে একটি অবৈতনিক ব্যাঙ্গ-বাদবাজারের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নাট্য-সম্প্রদায়ে অবৈতনিক কবির মাটিকেল অনুষ্ঠান যত রচিত পৌরাণিক নাটক “শশিষ্ঠা” অভিনয়ার্থ যনোদীত হয়। যাত্রা

উপযোগী কতকগুলি গীত রচনার আবশ্যক হওয়ায়, সকলে তৎসাময়িক প্রসিদ্ধ গীত রচয়িতা বাবু প্রিয়নাথ মল্লিকের নিকট গমন করেন; কিন্তু বহু যাতায়াতের পর তাঁহার নিকট একদানিও গীত না পাওয়ায়, গিরিশ বাবু বিরক্ত হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে উদ্দেশজন চৌধুরী মহাশয়কে বলেন,—“এত কষ্ট কেন? আয় আমরা হ’জনে যেমন পারি, গান দাঁদি।” উভয়ে উৎসাহের সহিত উক্ত ব্যাঙ্গের গান রচনা করিলেন। উত্তরকালে বিনিমোঁ গীত রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার রচিত গীত এই সময় সাধারণের নিকট প্রথম পরিচিত হইল। পাঠক-গণের কৌতূহল নিবারণার্থ এখানে দুইটি গীত উদ্ধৃত হইল,—

(১) দেববাণীকে কুপ হইতে উদ্ধার করিয়া দাওতি !—

বেলাথ—একতালা ।

(সবি থর থর—সুরে থের)

আতা ! মরি—মরি !

অম্পমা ছবি, মায়া কি খানদী,

ছলনা মুক্তি করে বনদেবী !

রঞ্জিত হোবনে বনন অমল,

নরন-কমল-মীর ঢল ঢল,

দিত্ব চুম্বিত, বৈদী আলোড়িত,

নিমোহিত চিত্ত হেরি মাধুরী ॥

জননী হেন গহন কাননে,

কি ভাবে ভামিনী ব্যজিয়া ভবনে,

আসিয়াছে এই স্থানে ?

দারুণ কটিন এর পরিজন,

তাই একাকিনী রমণী-রতন,

কেবা এ রমণী, কেন অনাধিনী,

মাগলিনী বুঝি প্রিয় পরিহারি ॥

(২) সমীচ প্রতি শব্দিতা :—

আত্মনা—একতালা ।

অতুল জ্ঞান হেতিয়ে ।

বিদ্যুৎ মন, নিরাক্ত সে বন, সাধন করি গই—

যে বিনা দহে দ্বিগে ।

চিত্র-মোহন, দিনোম-বন্দন, আর কি পাব কতু দরশন,
মধুর বচন, করিব শ্রবণ,
পরশে পূরার সাধ—

সরল হামি বিমল-অধরে, অস্থপম জাঁখি মানস ধরে,
কেন রতনে না রাখিহু ধরে, দুকাল মন হরিরে।

পাইকপাড়া রাজবাটীতে যৎকালে মহোৎসবোৎসবে রক্তাবলী, অশ্রুতা
প্রদীপ্ত নাট্যকণ্ঠিনের চলিতেছিল, তৎকালে অভিনয় দর্শনার্থে একদানি
টিকিট পাইবার জন্য ভক্তলোকগণ লালান্ত্রিত হইতেন, এমন কি যিনি
একদানি টিকিট সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেন, তিনি আপনাকে
সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিতেন। তিশোরবয়স্ক গিরিশ বাবুর মনে উক্ত
রাজবাটীর অভিনয় দর্শন লাভনার পরিবর্তে, একরূপ একটা বিয়েটার
করিবার বাসনা হইয়াছিল। সে ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিবার আশায়
বরাবর তিনি সুযোগ খুঁজিয়া থাকিতেছিলেন। একদে যাত্রা-সম্প্রদায়
সংগঠনে তাঁহার মনোবৃত্তি-নিষ্কির উপায় হইল। গিরিশবাবু ৮নং
নাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বর্ষদাস সুর প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত
হইয়া বাগবাগার নুখুলো পাড়ার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র হালদার মহোদয়ের
বাটীতে ‘সববার একাদশী’ অভিনয়ের আয়োজন অহুতানে প্রদত্ত
হইলেন। বঙ্গীয় নাট্যশালায় জনকস্বরূপ এই ‘সববার একাদশী’
সম্প্রদায়ের শিক্ষক এবং নেতার পদ গিরিশ বাবুর উপরেই অর্পিত
হইল। যৎকালে উক্ত সম্প্রদায় নবোৎসাহে অভিনয় খুলিবার নিমিত্ত
প্রস্তুত হইতেছিল, সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অরুণ-
শেখর মুখার্জী আসিয়া যোগদান করেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ৮শারদীয়া পূণ্যার সপ্তমী রাত্রিতে
বাগবাগার নুখুলো পাড়ার ৮প্রশস্তক হালদারের
রক্তমকে নাট্য-প্রতিষ্ঠা।
বাটীতে “সববার একাদশী”র প্রথম অভিনয় হয়।
সে সময় প্রত্যেক নাটকেই প্রায় মট নটী লইয়া একটা প্রভাবনা

প্রাকৃত, কিন্তু সন্ধ্যার একাদশীতে তাহা না থাকায়, তৎকাল প্রচলিত প্রবাদমত দ্বারাশব্দ নট-মটী মইয়া একটি প্রস্তাবনা এবং আবশ্যকবোধে কয়েকটি গানও রচনা করিয়া যেন। এই নাটকের অভিনয়ে গিরিশ বাবু “নিমটীদে”র ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রথম অবতীর্ণ হইলেন। নিমটীদে’র ভূমিকা অভিনয় করিতে হইলে, নানাবিধ ইংরাজী কাব্য প্রাতিষ্ঠিত করার অত্যাশা থাকা আবশ্যক। এনিমিত্ত উক্ত ভূমিকার অভিনয় সাধারণ অভিনেতার দ্বারা অসম্ভব এইরূপ সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে গিরিশবাবু উক্ত উক্ত ইংরাজী কাব্যের আবৃত্তি ও নিম্না দর্শকগণকে বৈশ্বপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, ততোধিক বিস্মিত হইয়াছিলেন।

“সন্ধ্যার একাদশী”র সাতবার অভিনয় হয়, তদ্ব্যতীত চতুর্থ অভিনয় অবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেঙরান প্রায় রামপ্রসাদ মিত্রের জামবাজীরের রূপে এই অভিনয় হইয়াছিল। অভিনয়কালে যকের তৎকালীন গণ্য নাট্য বরেণ্য সুধীশ্বর উপস্থিত ছিলেন। গ্রন্থকারী মীনবন্ধ বাবুও আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। সমবেত ব্যক্তিগণ সকলেই একমুখে এই অভিনয়ের বিশেষ প্রশংসা করেন। অভিনয়ান্তে মীনবন্ধ বাবু গিরিশচন্দ্রের নাট্য-কলা-কুশলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন,— “তুমি না থাকিলে এ নাটক অভিনীত হইত না; নিমটীদে’ যেন জোসার অন্তই লেখা হইয়াছিল।”

কলিকাতা হাটকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি বঙ্গদৌরব শ্রীযুক্ত সারদা-প্রসাদ নিজ মহোদয় উক্ত প্রাচীর অভিনয় দেখিয়া বক্ষিতের সম্পাদিত “বঙ্গদর্শনে” লিখিয়াছিলেন,— “নিমটীদে’র অভিনয় দেখিয়া আমি আশ্চর্যে আশ্রুত হইলাম। * * * সে রাজের নিমটীদে’র অভিনয় গোঁড়ের করমণ্ড ভুলিষ না। * * * অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য গিরিশের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা হইল। অনতিবিলম্বেই গিরিশ-

বাবু সজিত সুপরিচিত হইলাম। গিরিশবাবু এখন আমার
প্রভুর বন্ধু।”

“সববার একাদশী” অভিনয়ের পক্ষে সবে গিরিশবাবু দীনবন্ধু বাবুর
“বিয়ে পাগলা বুড়ো” প্রহসনেরও অভিনয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।
চৌরঙ্গালাগানের প্রসিদ্ধ বনী ভল্লভান্যায়ণ দত্ত (ঐযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ
দত্তের পিতামহ) মহাশয়ের ভবনে ইহার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল।
‘সববার একাদশী’র পর প্রহসনের অভিনয় হয়। গিরিশবাবু নিম্নটান
বেশে ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’র প্রস্তাবনা করণ ঘূর্ণে ঘূর্ণে একটি কবিতা
আবৃত্তি করেন। কবিতাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মাতলাসীটে ফুটিরে শেল, দেখুন সুযোগ চং।

হাসর ঘরে চৌপের গ’রে কিবা বিয়ের ঢং।

আয়না নসে, রত্না কোথো বা পারিস ত্য’ন।

ক্ষমা করিলেন চৌষ রসিকনগুন।

অংলজে এগার ছোঁড়ার দল, ভুদনো নসে রত্না।

সভাগণ নন্দহার নুরানো আমার কথা।

বাগবাচারে বাজা-সম্রাটের প্রতিষ্ঠা ও মাইকেলের ‘শর্শিটা’
অভিনয়,—এই গিরিশ বাবুর নাট্যকলার প্রথম
বাজার প্রতিষ্ঠা।

তখন, এ কথা পুকেই বলা হইয়াছে। বাজা সম্রা-
টের হইতে শ্রবণ হইয়া থিয়েটার-সম্রাটের সৃষ্টি করিলেও, বাজা-সম্রা-
টের আন্তর্য লোপ পায় নাই, উক্ত সম্রাটের সভাগণ যথো যথো
শর্শিটা অভিনয় করিতেছিলেন। গিরিশবাবু যখন “সববার একাদশী”
অভিনয় করিয়া একত্র নব্বাবদৌলখান প্রতিষ্ঠা ও ব্যাতি লাভ করিলেন,
তখন বাজা-সম্রাটের কেহ কেহ বলিয়াছিলেন,—“থিয়েটার করিয়া
অব্যক্তি পাওয়া কঠিন নহে, কিন্তু যাত্রা করিয়া ব্যক্তি লাভ করা
বড়ই কঠিন কথা।” একথা গিরিশ বাবুর প্রতিপর্শ করিল; যৌবন-

দুসত উত্তেজনা-বশে বিরশবাবু বলিলেন,—“আটদিনের মধ্যেই তোমাদিগকে যাত্রা শুভাইয়া দিব।”—বেহন কহা, সঙ্গে সঙ্গে অমনি কাঁধারত। সেই প্রাতেই বিরশবাবু বজ্রগণের সহযোগে ৩৭খিলাল সরকারের “উষা বরণ” নাটক অভিনয়ার্থ সন্মোদিত করিয়া তাহাতে ছাঞ্চিনখানি মুক্তন দ্বিত রচনা করিয়া দিলেন। মহা উৎসাহে মহলা চণিতে আদিল। গিরিশচন্দ্রের প্রতিক্রতি কার্যে পরিণত হইল। আটদিনের মধ্যেই “উষা বরণ” অভিনয় করিয়া সর্বাধারবশকে ক্ষান্ত করিয়া দিলেন। উষাবরণের একটিমাত্র দ্বিত সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। * নিম্নে সে দ্বিত উদ্ধৃত হইল।

জলিত বিভাস আড়াঠেকা।

গোখাল বামিনী, বহে দীয়ে দমীরণ।

দুসর-বরণ শরী তারকাহীন গগন ॥

মাহিছে বিহগবুল, কোটে নানাদিগ ফুল,

কাননে কোভা পুতুল, আকুল নমুনগণ ॥

দিনোদে বিদার দিহে, কাতরা-কুম্বী-হিহে,

জলে মুখ লুকাইয়ে করিছে বোদন ॥

কমল বিমল নীয়ে, আগিছে আগিছে দীয়ে,

দুসঃ পাইব সিঁহিরে, হবে শুভ সজিলন ॥

‘সম্ভবান একাদশী’ সর্কারজলন্তরূপে অভিনীত হইলে, দাম্যবজ্রবাবু প্রতিক্রিয়ায় রাজ্যত, গিরিশচন্দ্রকে “দাম্যবজ্রী” নাটক অভিনয় করিবার তাপকাল থিরটায়ের দত্ত অনুমোদে করেন। তখন গিরিশচন্দ্রের আবেগ প্রাণমতিত।

অনুসারে সম্ভবান ‘দাম্যবজ্রী’র রিহাৰ্শেল রিতে প্রারম্ভ করিল। এই সম্ভবানের হৈল মার্মেনজার ছিলেন—অর্থী

* সংগীত উষাবরণ নাটকের অনুসন্ধিকালিত দুইটি দ্বিত আদ্যালের হস্তগত হইয়াছে। নাট্যলিপিদের অসামান্য লাক্ষ্য তাহা প্রকাশিত হইবে। পরে স্বঃ।

ধর্মবাস ভ্রম ;—যিনি কালে পবিত্র পবিত্রিত সঙ্কল্পে নাট্যশীলিনী বনিতা নাট্যজগতে আখ্যাত হইরাছিলেন। গিরিশ চন্দ্রের ব্যবস্থাসূচক ধর্মবাস বাবুর তত্ত্বাবধানে stage নির্মাণ আরম্ভ হইল। জীলাবতীর রিহার্সেল চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে চুপড়াদিও প্রস্তুত হইতে লাগিল। stage সম্পূর্ণ হইলে রূপাবন পালের গলিতে রাজেন্দ্রপালের আবাসভবনে নূতন stage বাসিতা 'লীলাবতী' প্রথম অভিনীত হইল।

প্রথম সম্প্রদায় ধীনবন্ধু বাবুর 'লীলাবতী' নাট্যকালিনের মত প্রস্তুত হইতেছিলেন—তখন একদিন গিরিশ বাবু সহসা অনিলেন—“অগ্রসিক উপকাসিক বন্ধিমদারু ও সাধাবনী সম্পাদক শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়দের শিক্ষাবিধানে কিছু কিছু বাদ দিয়া ও পরিবর্তন করিয়া চুচড়ায় 'লীলাবতী' অভিনীত হইয়াছে। গিরিশ বাবু এই সংবাদ গাইগাই প্রকাশ করিলেন, নাটকের কিছুমাত্র পরিবর্তন না করিয়া, নাট্যকাব্যের একটী কথার বাদ না দিয়া আমরা অভিনয় করিব—তবু অভিনয় নাই, চুচড়ার দলকে প্রতিদ্বন্দ্বীতার পরাজিত করিব।”—অজ্ঞপ্ত মধ্য সময়ে হইয়া রিহার্সেল দিয়া প্রায়বাক্যে রাজেন্দ্রপাল পালের বাসিতে হঠাৎ রজনকে 'লীলাবতী' নাটকের প্রথম অভিনয় হইল। অভিনয় রজনীতে বহু গণ্য মাতা বালি এবং প্রথম নাট্যকার উপস্থিত ছিলেন। গিরিশ বাবু লগিতের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধীনবন্ধু বাবু অভিনয়দর্শনে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অভিনয়রম্ভে অতি ব্যস্ততার সহিত টেবের মধ্যে আসিয়া বলেন,—“এবার চিঠি লিখবো হুয়ো বন্ধিম।” গিরিশ বাবুকে বলেন,—“আমার কবিতা যে এমন কারো পড়া যায়, তাহা আমি জানিলাম না ; take this complement at last 'লীলাবতী' অভিনয় হইতে এই থিয়েটার-সম্প্রদায় 'দ্বাপত্যাল থিয়েটার' নামে অভিহিত হয়।

এইরূপে বাগবাজার দিয়ারটার সম্প্রদায় “সংস্কার একাদশী” ও “নীলদর্পণ” অভিনয় করিয়া একপ নশ লাভ করে।
 যে, সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শনার্থী পরসংখ্যক দর্শক-
 ভাণ্ডার।
 আসিয়া উপস্থিত হইত এবং শত শত ব্যক্তি হুনি-
 ভাবে কিরিয়া যাষ্টত। এ নিমিত্ত সম্প্রদায় “ফ্রি টিকিট” বিতরণের
 ব্যবস্থা করেন। কিন্তু টিকিটের নির্দিষ্ট একপ লনতা ও এক অধিক
 চিঠি আসিতে আরম্ভ হইল যে, সম্প্রদায় নিয়ম করিলেও, যে যে লোককে
 টিকিট দেওয়া হইবে না, বাহায়া অভিনয় বুঝিতে সক্ষম, তাঁহাদিগকেই
 টিকিট দেওয়া হইবে। তাহাতে অনেকে আপন আপন উপযুক্ততার
 “সার্টিফিকেট” লইয়া, অভিনয়রাত্রির তিন চারিদিন পূর্বে হইতে বসে
 ললে আসিতে আরম্ভ করিতেন। যাহাই হউক, সম্প্রদায় তৎপরে
 দ্বিগুণ উৎসাহে বাবু ভুবনমোহন নিয়োগীকে গঙ্গাতটস্থ সুন্দর ঠৈরীক-
 খানায় “নীলদর্পণের” বিহারভাল দিতে লাগিলেন। বিহারভাল সমাপ্ত
 হইলে, দর্শকবৃন্দের আগ্রহাতিশয় দর্শনে সম্প্রদায়, ঐক্রে থিয়েটারের
 “জাস্তাভাল থিয়েটার” নাম দিয়া টিকিট বিক্রয় করিবার প্রস্তাব
 করেন। এ প্রস্তাবে তাঁহাদের অভিনয়-শিক্ষক গিরিশচন্দ্র অসম্মত
 হন। তিনি বলেন,—“আমাদের রঙ্গমঞ্চ, দুস্তপট ও অস্ত্রাঙ্গ লাজ-
 সহজাম এখনও একপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, যাহাতে
 “জাস্তাভাল থিয়েটার” নাম দিয়া, টিকিট বিক্রয় করিয়া, সাধারণে
 প্রকাশিত হওয়া যায়।” কিন্তু সম্প্রদায়ই অবিকার্যই একপ উত্তেজিত
 হন যে, তাঁহাদের শিক্ষাগুরু,—বিহার বিপুল অধ্যাবসায় গুণে সুশিক্ষিত
 হইয়া, তাঁহারা, “নীলদর্পণ” অভিনয়ে একপ নবোৎসাহে প্রোত্ত হইয়া-
 উলেন, সেই গিরিশ বাবুকে কথা রক্ষা করিতে অনম্মত হইলেন।
 চিরস্বামীনি নির্দিষ্ট বাবু, তাঁহার বহু যত্নের শিক্ষালানের “নীলদর্পণ”
 অভিনয় দর্শনে, সাধারণে কিরণ হস্তবা প্রকাশ করে সে কোতুলক

পালকোতে বিজু ১২ করে পাল,
কিবা ধর্ম ১৩ ক্ষেত্র ১৪ স্থান,
অতিমর্দি ১৫ সুবিদ্যবি করছে বাঁসে থানি ;
সবাই খিলে ডেকে বলে, দীনবন্ধু ১৬ কর' পার ॥
কিবা বলুয়র বেলা ১৭,
পালে পাল ১৮ রেতের বেলা ১৯
জুবনমোহন ২০ চরে ২১ করে গোপালে ২২ দেলা ;
বিছে ক'রে আশা, বরু চান্না ২৩
নীলের ২৪ গোড়ার দিজে সার ২৫ ॥
কলকিত শব্দী ২৬ হরমে, অমৃত ২৭ বরমে,
জান কর বা নীলের ২৮ গোণব এতদিনে ধরে ;
হাস-মাথায়ে গাড়ী-গাড়ী—
পরমা রে রেখে বাহার ২৯ ॥

—ইনি বেশখা চইতে গান করিতেন। ১৩। ৮ রঙ্গদাস বুর—টেল মানেজার।
১৪। জীবন গোড়াবোহন পাতুলি—অভিনেতা। ১৫। ৮ অধিনাশ চক্র আর—
অভিনেতা। ১৬। নাট্যকার ৮ দীনবন্ধু বিজু। ১৭। ৮ অমৃতবল মুখোপাধ্যায়
(বেল বাবু)—রংগসিদ্ধ অভিনেতা। ১৮। জীবন রাণেন্দ্রলাল পাল প্রভৃতি পাল
বানীর কয়েকজন। ১৯। রেতের বেলা—রাত্রিতে মিহানেল হইত। ২০। জুবন
মোহন মিত্রাচাঁদ। ২১। চরে অর্থাৎ বেড়ায়। জুবন বাবুর কোনও নির্দিষ্ট কাল
হইত না। ২২। ৮ গোপাল চন্দ্র দাস—অভিনেতা। ২৩। সবগোণ জাতীর অমোক্ত
এই লক্ষণোক্তকৃত ছিলেন। ২৪। নীলবর্ণের নোটক। ২৫। সার অর্থাৎ বিষ্ঠা; এতলে
কাথানিশুভ্রাও ওতবে সুখাইতেছে। ২৬। শিল্পজীবন দাস—অভিনেতা। ২৭। জীবন
অমৃতবল বাবু—পরিচয় অনাবশ্যক। ২৮। ৮ দীনবন্ধু বিজু। ২৯। লক্ষ্যকার দৈত্যবিক
বরণ্যে, কাহারও জ্ঞান অংশে বিবেক রহিল না,—অর্থাৎ চিত্তিকট কিনিবেই
অংশেবিকার।

এদিকে সম্প্রদায় কলিকাতা, যোড়গাঁও ৬ মধুসূদন সায়্যাক
মহাশয়ের বাগীতে (উপস্থিত স্ববায়ু ঘড়ীঘরাণা বাড়ী
পত্রিকার সম্প্রদায়
হইরাছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ ৭ই ডিসেম্বর তারিখে,
পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

নীলদর্পণের প্রথম অভিনয় করেন। ইহার পূর্বে
হইতেই গিরিশবাবু ৭৫ টাকা বেতনে জন 'অ্যাটকিন্সন কোম্পানীর'
অফিসে সহকারী বুক কিপারের কার্য্য করিতেছিলেন। ক্রমে
ক্রাসনাল সম্প্রদায় জামাই ব্যারিক, নবীন তপস্বিনী প্রভৃতি কলমানি
নাটক অভিনয় করিয়া, পরে মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটক অভিনয়ার্থে
নির্ধাচিত করেন। কিন্তু ভীষ্ম-সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত
গিরিশবাবুর আবশ্যক। সম্প্রদায় ইতস্ততঃ করিয়া, সপক্ষে গিরিশবাবুর
বাগী আসিয়া, তাঁহাকে বরিয়া বসিলেন। শৈশব-বঙ্গদলের কলুরোধ
জিনি এড়াইতে পারিলেন না,—অনৈতিক ভাবে তিনি থিয়েটারে
যোগ দিয়া অফিস ও থিয়েটারের দুই কার্য্যই চালাইতে লাগিলেন।
গিরিশবাবু আপনার নাম প্রকাশে অসম্মত হওয়ায় কৃষ্ণকুমারী নাটকের
ক্রান্তিবিলে এইরূপ লিখিত হইত—“ভীষ্মিং—A distinguished
Ama-teur” কৃষ্ণকুমারী অভিনয়ে রাণী ভবানীর প্রণেত্র নাটকের
মহারাজা চন্দ্রনাথ রাই বাহাদুর, পরেও আপনার রাজপরিষদে গিরিশ-
বাবুকে ভীষ্মিংহে বসাইয়াছিলেন। ক্রাসনাল থিয়েটারে বসেই আর
হইতে লাগিল। কার্য্যের শ্রুশ্রুতার নিমিত্ত সকলে গিরিশবাবু,
অমৃতভাদ্রার পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ
ও ৬ বেবেল্‌সনাব কন্সোপাধ্যায় মহাশয়কে তাইয়েটীর নির্ধাচিত
করেন। ইহাতে কার্য্যের দুরলোভ হইলোও পরে দভাগনের আত্ম-
বিক্ষেপে দুইটা দলের প্রতি হইয়া, ন্যাসন্যাস থিয়েটার সাধারণ ভবন
হইতে স্থানান্তরিত হইল।

অত্যন্তকাল মধ্যে উভয় দল পুনর্বার সম্মিলিত হইয়া শ্রীযুক্ত কুমার-

মোহন নিয়োগীর স্বাধিকারীকে উপস্থিত মিনার্জা থিয়েটারের
 জমীতে—“গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার” নাম দিয়া
 গ্রেট ন্যাশনাল থিয়ে-
 টারের প্রতিষ্ঠা রূপে স্থায়ী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। গিরিশ
 বাবু প্রথমে এ দলে ছিলেন না, পরে অহুরোধে
 পড়িয়া, মধ্যে মধ্যে অবৈতনিক (Amature) ভাবে অভিনয়
 করিতেন। এই সময়ে তিনি বন্ধনবাবুর ‘মৃণালিনী’ নাটকাকারে
 পরিবর্তিত করেন এবং মাউসি, Charitable dispensary, Hos
 & Bull প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাক্টোমাইনও অভিনয়ার্থে
 রচনা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে তাঁহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বিশেষ অহুরাগ
 জন্মে। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের পুস্তক অধ্যয়নে
 হোমিওপ্যাথি
 চিকিৎসা। প্রতিবাসী ও দীন-দরিদ্রগণকে বিনা ব্যয়ে ঔষধ
 ব্যবস্থা দানে আরোগ্য করিয়া এরূপ যশোলাভ করেন
 যে, একদিন পল্লীস্থ জনৈক ভক্তব্যক্তি তাঁহার এক প্রবাণা আত্মীয়কে
 গঙ্গাতীরস্থ করেন। গিরিশবাবু রোগীকে দেখিয়া ঔষধ দিবার
 প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু পাছে রোগী আরোগ্যলাভ করে ও তাঁহাকে
 পুনরায় গৃহে আনিতে হয়, এই ভয়ে তিনি গিরিশবাবুর সহিত
 আর সাঙ্গাৎ করিলেন না। বস্তুতঃ তাঁহার চিকিৎসার উপর তৎকালে
 সাধারণের বিশেষ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু তিনি বাহাদিগকে
 ঔষধ দিতেন, তাহাদিগকে বধাসময়ে ফলাফলের সংবাদ দিতে
 বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন—এমন কি অনেক সময়ে ঔষধের
 ফলাফল জানিবার জন্ত, আফিসের কার্যে তিনি অন্তমনস্ক হইতেন এবং
 দ্বায়ে তাঁহার ঔৎসুক্যবশতঃ নিজের বিশেষ ব্যাধাত হইত। কিন্তু
 অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহাকে যথাসময়ে রোগীর অবস্থা জ্ঞাপন করিতে
 বিলম্ব করিত, কেহ বা সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়া, আর তাঁহার সাহিত

সাক্ষাৎই করিত না। এইরূপ নানা কারণে বিরক্ত হইয়া, তিনি উক্ত চিকিৎসা একপ্রকার পরিত্যাগ করেন।

শেষ জীবনে আবার বিশেষ উৎসাহের সহিত চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও দীনদরিদ্র তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে ও বিনা মূল্যে ঔষধ সেবনে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। অতি দরিদ্র পণ্যের নিমিত্ত সৰল না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ অর্থ সাহায্য পাইত।

আফিসের বড় সাহেব মিঃ অ্যাটকিন্সন গিরিশবাবুকে বিশেষ ম্হেহ করিতেন। গিরিশবাবুর তথায় ছয় বৎসর কার্যের পর, অ্যাটকিন্সন বিলাত গমন করিলে, আফিসের ছোট সাহেবের সহিত তাঁহার কথান্তর হওয়ায়, তিনি উক্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, “ইণ্ডিয়ান লিগে” ছেড ক্লার্কের পদে নিযুক্ত হন। ছোটলাটি টেম্পেল সাহেবের সারথী দাপন এণ্ড প্রবর্তনের সময় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বিরুদ্ধ হওয়ায় মধ্যম শ্রেণীর প্রতিনিধি হইয়া এই ইণ্ডিয়ান লিগ বিশেষ কার্য্য করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী, গ্রেট স্ক্রাশক্যাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীত্ব ত্যাগ করিয়া, লক্ষ্যদায়ের সভ্যগণ মধ্যে উক্ত মঞ্চালয় ভাড়া দিলেন। অধ্যক্ষতার ভার গিরিশবাবু গ্রহণ করিলেন। এই সময় তিনি মেঘনাদবধ, পলাশীর যুদ্ধ, বিষ্ণুস্কন্ধ, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কাব্যোপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্তিত করেন এবং স্বয়ং আগমনী, অকালবোধন, দোল-লীলা প্রভৃতি কয়েকখানি গীতিনাট্যও অভিনয়ার্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মেঘনাদ, রাম, ক্লাইব, নগেন্দ্রনাথ, জগৎসিংহ, পশুপতি প্রভৃতি ভূমিকার (part) অভিনয় দেখিয়া বিজয়গুপ্তী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মেঘনাদবধে তিনি মেঘনাদ ও রামের দুইটা ভূমিকাই অভিনয় করিতেন। এককালীন এই দুইটা বৈবক্ষ্য অংশ, এক ব্যক্তি দ্বারা তুল্যরূপ উৎকৃষ্টভাবে অভিনীত

হইতে দেখিয়া, দর্শকমণ্ডলী যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন ।

বিখ্যাত কল্পতরু প্রণেতা সুরসিক শ্রীযুত ইন্ড্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত সাধারণী পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—“বঙ্গে গিরিশ অপেক্ষা যে, কোন দেশে পারিক অধিক জনসাধারণী ছিল, ইহা আমাদের ধারণা হয় না ।”

ইহার কিছুদিন পূর্বে তাঁহার জী বিয়োগ হয় । প্রথমে তাঁহাকে তাদৃশ বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই । কিন্তু ক্রমে জী-বিয়োগ ।

দিন দিন সেই শোক গাঢ় হইয়া, তাঁহাকে সকল কার্যে উদাসীন করিয়াছিল । তৎপূর্বে তাঁহার নিকট যে সকল রচিত কবিতা, গীত বা পুস্তক অপ্রকাশিত হইয়া রক্ষিত ছিল, সে সকল, এমন কি—অধায়নের নিমিত্ত পূর্বে যে সকল মূল্যবান গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়া-ছিলেন, সেগুলি পর্যন্ত মষ্ট হইয়া যায় । ক্রমে তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, “ফ্রাইবার্গার কোম্পানীর” আফিসে বুকশিপার হইয়া ভাগলপুরে গমন করেন । এই স্থানে তিনি অবসর মত ধৃত্তরা, আধার, চাতক, শৈশব-বাক্য, হলদীবাটের যুদ্ধ প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন । “নলিনী” নামক মাসিক পত্রিকায় এই সকল কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় । “হলদীবাটের যুদ্ধ” কবিতা এত সুন্দর হইয়াছিল যে, অক্ষয় বাবু তাঁহার “সাধারণী” পত্রিকায়, উক্ত কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলেন,—‘একপ গভীর শোকপূর্ণ কবিতা বঙ্গভাষার বিরল ।’

ভাগলপুর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি “শার্কীর কোম্পানীর” আফিসে বেড়শত টাকা বেতনে, বুকশিপারের কার্যে প্রবৃত্ত হন ।

কিছুদিন পরে প্রভাপটাব জহরী, “গ্রেট ভাষাভাল থিয়েটারের”
 মহাবিকারী হইয়া, গিরিশবাবুকে ম্যানেজার হইবার
 গ্রেট ভাষাভাল থিয়েটারে অধ্যক্ষতা। নিমিত্ত, বিশেষ অনুরোধ করিলে, নাট্যাঙ্গুরাগবশতঃ
 তিনি আফিলের কার্য পরিচালাপূর্ব্বক একশত
 টাকা বেতন গ্রহণ করিয়া, “গ্রেট ভাষাভাল থিয়েটারের” অধ্যক্ষতা
 গ্রহণ করিলেন। থিয়েটারের কার্যে তিনি এই প্রথম বেতনভোগী
 হইলেন। এখানে তাহার রচিত প্রথমে মায়াক্তক, পরে মোহিনী-
 প্রভিন্দা, আলাদিন, আনন্দরহো, রাবণ বধ, নীতার বনবাস, পাণ্ডবের
 অজ্ঞাতবাস, অভিমুখ্য বধ, নীতাহরণ, রামের বনবাস, নীতার বিবাহ,
 লক্ষ্মণ বর্জন, মলিনমালা, ভেটিমঙ্গল, ব্রজবিহার প্রভৃতি নাটক ও
 গীতিনাট্যাদি অভিনীত হয়। রাবণবধ তাহার প্রথম নাটক। রাবণ-
 বধ নাটকে মুক্ত হইয়া ইক্ষনাথ বাবু, গিরিশবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া
 একশানি পত্র লেখেন।

অতঃপর গিরিশ বাবু পণ্ডিতবর রমেশচন্দ্র দত্তের “মহাবীকরণ”
 নাট্যাকারে পরিবর্তিত করেন। গ্রেট ভাষাভাল থিয়েটারে এই নাটক
 অভিনীত হয়। এই নাটকে গিরিশ বাবু একাদিক্রমে সাতটি ভূমিকা
 গ্রহণ করিয়া অভিনয় কুশলতার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।
 অবশেষে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের বেতনবৃদ্ধি লইয়া জহরী
 মহাশয়ের সহিত গিরিশ বাবুর মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। তাহার
 ফলে তিনি গ্রেট ভাষাভাল থিয়েটারের সংশ্রব পরিত্যাগ করেন।

এই সময় শুশুৎ রায় নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির স্বত্বাধিকারীভে
 ইার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা গিরিশবাবু, শ্রীধৃত অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র
 ও গিরিশবাবুর প্রভৃতি লইয়া নূতন সম্ভার্য গঠন পূর্ব্বক “টার”
 অধ্যক্ষতা। থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। সে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের
 কথা। বিডন ষ্ট্রিটের ৬৮ নং বাড়ীতে এই নব বঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত